کلمہ کی دعوت

حضرت مولانا محمد سعد کاندھلوی

কালিমার দাওয়াত

(প্রথম খণ্ড)

মূলঃ হযরত মাওলানা সা'দ কান্ধলভী (দা. বা.)

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস শরিয়তপুরী
শিক্ষক, আব্দুল্লাহপুর কাসেমিয়া বাইতুল উলূম মাদ্‌রাসা
টঙ্গিবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।

মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪৫, বাংলাবাজার, কম্পিউটার মার্কেট
ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

বয়ান-১

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيأت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد.

মেরে দোস্তো বুযুর্গো আযীযো! আমাদের উপর অনেক বড় এক দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। আমাদের উচিৎ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কথাগুলো শোনা। অতঃপর অন্যকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসা। যদি কথা মনোযোগের সাথে শোনা না হয় তাহলে দাওয়াতও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই মনোযোগের সাথে কথাগুলো শোনা চাই এবং তাকে দাওয়াতে নিয়ে আসা চাই।

আর যে কথার দাওয়াত দেয়া হবে সেটাই এক্বীনে পরিণত হবে। আর যে কথা দাওয়াতে পরিণত হবে না, তা এক্বীনেও পরিণত হবে না। আর যখন তা এক্বীনে পরিণত না হবে তখন তা আমলেও বাস্তবায়িত হতে পারবে না।

দ্বীন আমলে বাস্তবায়িত হওয়ার রাস্তার নামই হলো এক্বীন। আর এক্বীনে পরিণত হওয়ার রাস্তা হলো দাওয়াত।

তাই সর্বপ্রথমে আরয হলো, কথাগুলোকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শোনা হোক। পরিপূর্ণ কথা শোনা চাই এবং পুরো কথাই দাওয়াতে আনা চাই। কারণ, দ্বীন যিন্দেগীতে আসবে এক্বীনের রাস্তায়। নিরেট জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দ্বীন জীবনে আসবে না। আর এক্বীন অর্জিত হবে দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হলো এক্বীন পয়দা করা।

দ্বীন এখনো লোকদের বলাবলির মধ্যেই সীমিত রয়েছে। যখন দ্বীন যখন দাওয়াতের মধ্যে আসবে তখনই এক্বীনে পরিণত হবে। আর যখন দ্বীন দাওয়াতের মধ্যে আসবে তখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর হাক্বীকত দাওয়াতের মাধ্যমে অর্জন করা হবে। এ কারণেই কথাগুলোকে নিজ দাওয়াতের মধ্যে ও মেহনতের মধ্যে ব্যবহার করা চাই। কারণ, যে বস্তু মেহনতে আসবে তা এক্বীনেও আসবে।

এক্বীন হলো সর্বপ্রথম শর্ত। কারণ এক্বীন ছাড়া ওয়াদা পুরা করা হয় না। যতক্ষণ দ্বীনের মধ্যে যখন ওয়াদা পুরা হওয়া দেখা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিজের নযরে দ্বীন একটি হীন বস্তু ও হালকা বস্তু হয়ে থাকবে। মানব সমাজে দ্বীন একটি রুসমী ও প্রথাগত বিষয় হয়ে থেকে যায়।

দ্বীন দ্বারা কামিয়াবী ও সফলতা মানুষের এক্বীন অনুপাতে হয়ে থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তাঁর হুকুম পুরা করার মাঝে সুপ্ত। আর তাঁর কুদরত হলো, তার ওয়াদার সাথে সম্পৃক্ত। যদি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর এক্বীন না থাকে তাহলে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার খাযানা হতে উপকৃত হওয়া যাবে না। আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের জাতে 'আলীর কুদরতী খাযানা হতে সরাসরি উপকৃত হওয়ার জন্য অন্তর হতে পুরো কায়েনাতের তথা কুল মাখলূকাতের এক্বীন বের হয়ে যাওয়া প্রথম শর্ত।

মাখলূকের এক্বীনের সাথে আল্লাহ তা'আলার খাযানা হতে উপকৃত হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। তাই তো নবী-রাসূলগণকে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তা হলো কালিমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর দাওয়াত।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো আযীযো! এটা অনেক বড় এক পুঁজি। যা অর্জন করা ছাড়া মানব জীবন লাঞ্ছনা ও কষ্ট-ক্লেশ হতে মোটেও মুক্ত নয়। এটা ছাড়া মানুষ সর্বদা যাবতীয় অবমাননা, পেরেশানী ও অস্থিরতায় গ্রেফতার থাকবে। ঐ মূল্যবান বস্তুর নাম হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া উম্মত কখনো তার লাঞ্ছনাময় জীবন হতে মুক্ত হতে পারেনি। চাই যতই অস্ত্র হয়েছে, যতই সাজ-সরঞ্জামাদির ভাণ্ডার অর্জিত হয়েছে, ঈমান ছাড়া তাদের লাঞ্ছনা সুনিশ্চিত রয়েছে।

উম্মত যদি সম্মানিত হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র ঈমানের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছে।

উম্মত যদি সম্মানিত হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র কালিমার মাধ্যমেই সম্মানিত হয়েছে।

উম্মত যদি সম্মানিত হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র কালিমার মাধ্যমেই সম্মানিত হয়েছে।

উম্মত যদি সম্মানিত হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র আমলের মাধ্যমেই সম্মানিত হয়েছে।

কিন্তু উম্মতের সম্মুখে ঈমান বানানো ও কালিমার দাওয়াতের বিষয় এতটাই অপরিচিত হয়ে গেছে যে, যেন ঈমানের দাওয়াত ও কালিমার দাওয়াত নিরেট অমুসলিমদের জন্যই মনে করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা কালিমার দাওয়াতের লক্ষ্য যাঁদেরকে বানিয়েছেন খোদ তারাও ঈমানদ্বার ছিলেন।

সবচেয়ে বড় ভুল হলো, ঈমানওয়ালাগণ ঈমানের দাওয়াত, ঈমানওয়ালাগণ ঈমানের মেহনত এবং ঈমানওয়ালাগণই ঈমান বানানোর বিষয়ে গাফলতী প্রদর্শন করে যাচ্ছে। ঈমানওয়ালাগণ ঈমানের দাওয়াত ছেড়ে দিয়েছে। তারা এ ভ্রান্তির মাঝে পতিত যে, তারা ঈমানের দাওয়াতকে অমুসলিমদের জন্য বানিয়ে বসে আছে। কালিমার দাওয়াতকে বিধর্মীদের জন্য বানিয়ে বসে আছে। অথচ খোদ আল্লাহ তা'আলা ঈমান ওয়ালাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, হে ঈমানওয়ালাগণ! ঈমান আনো।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا

খোদ আল্লাহ তা'আলা ঈমানওয়ালাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, হে ঈমানওয়ালাগণ! ঈমান আনো। (সূরায়ে নিসা-১৩৬)

এ কথা বলেননি,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اٰمِنُوْا

হে কাফির সম্প্রদায়! ঈমান আনো।

বরং ঈমান ওয়ালাদেরকেই বলেছেন, হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো তোমরা ঐ ঈমান অর্জন করো যা আমার নিকট প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত। হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো তোমরা ঈমান অর্জন করো সাহাবাগণের ঈমানের মত।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, এখানে আননাস শব্দ দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। অতএব, এ আয়াতে কেয়ামত নাগাদ আগত মানবজাতিকে, কেয়ামত নাগাদ আগত ঈমানওয়ালাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সাহাবাগণের ঈমান অর্জন করার প্রকাশ্য দাওয়াত রয়েছে।

آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

খোদ আল্লাহ তা'আলা ঈমানওয়ালাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, সাহাবীদের মত ঈমান আনো।

ঈমান থেকে গাফেল হওয়া সকল লাঞ্ছনা ও সকল পেরেশানীর কারণ। তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গ! আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে যতগুলো ওয়াদা তাঁর পক্ষ হতে করা হয়েছে তা এক্বীন ছাড়া কখনো পুরা হবে না। অর্থাৎ ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার কোনো ওয়াদাই পুরা হয়ার নয়।

আল্লাহ তা'আলা যতগুলো ওয়াদা করেছেন, তার সবকটিই আমলের সাথে সম্পৃক্ত। তবে এ আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তখনই পুরা হবে যখন ঐ আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরা হওয়ার পরিপূর্ণ এক্বীন ও বিশ্বাস থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর এক্বীন না থাকলে নিরেট আমল করার দ্বারা তার ওয়াদা পূরণ হবে না।

আমলের এলমের ভিত্তিতেও ওয়াদা পুরা হয় না।

আর যদি আমল থাকে তাহলে ঐ আমল আছে, কিন্তু ঐ আমলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরা হওয়ার এক্বীন নাই। কেননা সেই আমল পরাকাষ্ঠা পর্যায়ের রুসমী ও রেওয়াজী সাব্যস্ত হবে। তা প্রাণহীন হয়ে থাকবে। যে আমলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার এক্বীন নাই সেই আমলের প্রতিদান স্বরূপ আমাদেরকে কী দিবেন?

স্মরণ রাখুন! নতুন সাথী হোন বা পুরান, একথা সকলকেই স্মরণ রাখতে হবে যে,

ঈমান ছাড়া আমল বনতে পারে না, এবং ঈমান ছাড়া আমলের উপর প্রতিদান পাওয়া যেতে পারে না। ঈমান ছাড়া পুরা দ্বীন জীবনে আসতে পারে না।

পুরা দ্বীন জীবনে আসার জন্য ও দ্বীনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ কামিয়াবী ও সফলতা অর্জন করার জন্য একমাত্র শর্ত হলো আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর পরিপূর্ণ এক্বীন। এই একটি মাত্র রাস্তা। ঈমানকে ঈমানের হাকীকতের সাথে অর্জন করা চাই। যখন ঈমান থাকবে না তখন আমল করার অনেক কারণ হবে।

কেউ আমল করবে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে।

কেউ আমল করবে অভ্যাসের দাস হয়ে।

কেউ আমল করবে সখ করে ও খাহেশাতের বশবর্তী হয়ে।

কেউ আমল করবে পরিবেশের শিকার হয়ে।

কেউ আমল করবে রাজনৈতিক চাপের শিকার হয়ে।

এসব কারণে আমল করার নাম দ্বীন নয়। বরং দ্বীনের সাথে খেল-তামাশা করার নামান্তর। বরং দ্বীনের দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকামকে পূর্ণ করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরতের পরিপূর্ণ কামিয়াবীর শতভাগ এক্বীন করা। অর্থাৎ নিজের দ্বীনের মধ্যেই নিজের সফলতা দেখতে পাওয়া। এটাই হলো ঈমানের আলামত।

ঈমানের দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পুরা করার পথে যত ধরনের বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসবে আমি তার কোনো পরোয়া করবো না। কারণ, প্রতিবন্ধকতা তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। আর তা আমাকে সফলতার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছানোর জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তরবীয়তও এর মাধ্যমে করবেন। ফলে আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতিও হতে থাকবে। এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার নিয়ম নীতি। এটাই হলো ঈমানের দাবি। এটাই হলো ঈমানের আলামত।

মেরে দোস্তো! যখন এই ঈমান না থাকবে তখন আমল করার স্পৃহা অন্তরে থাকবে না। বরং ঐ আমল হয়তো পরিবেশের কারণে হতে থাকবে। নয়তো অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে হতে থাকবে। নয়তো অভ্যাসের দাস

হিসেবে হতে থাকবে। তাইতো এ সকল মেহনত দৌড়-ঝাঁপ ঈমান বানানোর জন্য।

এ কাজের ভিত্তি,

এ কাজের উদ্দেশ্য,

নবীদের প্রেরণের লক্ষ্যবস্তু,

নবী রাসূলদের মেহনতের সূচনা এটাই।

সর্বপ্রথম সকল নবীই কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন।

তারপর শরীয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এরশাদ ফরমান, আমি যে কোনো নবী প্রেরণ করেছি তাকে সর্বাগ্রে কালিমার দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়েছি। বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেও সর্বাগ্রে কালিমার দাওয়াত এসেছে।

إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ

প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা'আলা এই একই দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর নবীগণ এ দাওয়াতকেই তাদের স্বজাতীয় লোকদের সামনে পেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সর্বপ্রথম এই একই কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন। সুতরাং

প্রথম মুবাল্লিগ (তাবলীগওয়ালা), প্রথম দায়ী

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কালিমার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন।

إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ

এরপর নবীদের মাধ্যমে তাদের উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। উম্মতের এক্বীন যতই বিগড়ানো ছিল, যতই তারা ভ্রান্ত বিশ্বাসের ধ্বজধারি ছিল, যতই তারা অন্ধকারের অতল গহ্বরে পতিত ছিল প্রত্যেক নবীই আপন দাওয়াত কালিমা দ্বারাই শুরু করেছেন।

পূর্বেকার যুগের লোকেরা ঈমান আনতো, চাই তারা যে কোনো নবীর উম্মতই হতো না কেন। অবস্থা এমন হতো যে, যখনই কোনো নবী দুনিয়া হতে বিদায় নিতেন তখন তাঁর সাথে দাওয়াতও বিদায় নিতো।

যখন দাওয়াত বিদায় নিতো তখন এক্বীনও বিদায় নিত।

যখন এক্বীন নষ্ট হতো তখন আমলও নষ্ট হতো।

আর আমল নষ্ট হওয়ার কারণে অন্তরের এক্বীন আমল থেকে সরে আসবাবের উপর চলে যেত।

মেরে দোস্তো! ও বুযুর্গ যখন দ্বীনের মাঝে কামিয়াবী ও সফলতার এক্বীন না থাকবে তখন দ্বীন জীবন থেকে বের হয়ে যাবে। আর যদি আমরা আমাদের অন্তরে দ্বীনের মাঝেই কামিয়াবী রয়েছে এ কথার এক্বীন পয়দা করে নেই তাহলেই আমরা দ্বীনের হক্বদার। সর্বযুগের কারগুজারী এটাই। সকল নবী-রাসূলগণের কারগুযারী এটাই ছিল।

নবী এসেছেন সাথে কালিমার দাওয়াতও নিয়ে এসেছেন।

আর কালিমার দাওয়াত দ্বীনের জীবনকে টেনে এনেছে।

নবী চলে গিয়েছেন, সাথে সাথে তাঁদের দাওয়াতও বিদায় নিয়ে গিয়েছে। আর দাওয়াত যাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও জীবন থেকে বের হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এক্বীন বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও বিদায় নিয়ে গেছে। কারণ, কালিমার দাওয়াত ছিল তখন এক্বীনও ছিল আর এক্বীনের বলে দ্বীনও ছিল। জী, এক্বীন থাকলে দ্বীনও থাকবে। আর এক্বীনই হলো দ্বীন, ঈমান ও ইসলাম। হ্যাঁ, নবী বিদায় নিয়েছেন তো দাওয়াতও বিদায় নিয়েছে। আর দাওয়াত বিদায় নিয়েছে তো ঈমানও বিদায় নিয়েছে। ঈমান বিদায় নিয়েছে তো ইসলামও বিদায় নিল। হ্যাঁ, বাকি থাকলো শুধু ইসলামী বেশ-ভূষাখানা মাত্র।

এরপর তাঁর পরবর্তী নবী এসে জাতিকে আবারও দাওয়াত দিয়েছেন। প্রত্যেক দুই নবীর মধ্যখানে যে বিরতি হতো ও দাওয়াতী কার্যক্রম ব্যাহত হতো এ বিরতিক্ষণে দাওয়াত না থাকার কারণে জাতির লোকেরা গোমরাহ হয়ে যেত। কারণ ঈমান বানানোর সামান ও উপকরণ খতম হয়ে গিয়েছে। ঈমান বানানোর সবচেয়ে বড় ও নিশ্চিত উপকরণ ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ তা খতম হয়ে গিয়েছে।

যখন দাওয়াত ইলাল্লাহ খতম হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলার জাতের এক্বীনও দিল থেকে উঠে গেল। সুতরাং এ কথাতো এক্বীনী বিষয়

যে, যেই বস্তুর দাওয়াত দেয়া হবে তার এক্বীনও দিলে বসবে। এটাই মানুষের স্বভাব ও রুচি যে, মানুষ যে বস্তুর দাওয়াত দিবে ঐ বস্তুর এক্বীন তার অন্তরে বসে যাবে। চাই

দাওয়াত ধন-সম্পদ বা রাজ-রাজত্বের হোক না কেন।

বা দাওয়াত পার্থিব সাজ-সরঞ্জামাদির হোক না কেন।

বা দাওয়াত স্বাস্থ্য-বিষয়ক ডাক্তারের হোক না কেন।

অথবা দাওয়াত নিরাপত্তা প্রদানকারী সরকারের হোক না কেন।

অথবা দাওয়াত রক্ষাকারী হাতিয়ার তথা অস্ত্র-শস্ত্রের হোক না কেন।

এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যেই বস্তুর দাওয়াত দেয়া হবে ঐ বস্তুর এক্বীন অন্তরে বসে যাবে। এমনটি তো কখনোই হতে পারে না যে, দাওয়াত দেয়া হবে আসবাব ও সাজ-সরঞ্জামাদির, আর এক্বীন পয়দা হবে আমলের প্রতি। আবার এমনটিও কখনও হবে না যে, দাওয়াত দেওয়া হবে আমলের আর এক্বীন পয়দা হবে আসবাবের। আবার এমনটিও কখনও হবে না যে, দাওয়াত দেওয়া হবে আসবাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তো তখনই আসবে যখন দিল থেকে আসবাবের এক্বীন বের হয়ে যাবে।

যখন আসবাবের এক্বীন বের হয়ে যাবে তখন আমাদের আরাম-আয়েশের যত আসবাব ও উপকরণ রয়েছে তা সব অমুসলিম শত্রুদের ধ্বংসের কারণ হবে। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের ধ্বংসের আসবাবগুলো ঈমানদারদের আরাম-আয়েশের উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ পুরো বিষয়টিই উল্টে যাবে। আল্লাহ তা'আলা যত ধ্বংসকর আসবাব বানিয়েছেন তার সবকটি আসবাব ঈমানওয়ালাদের আরাম আয়েশের জন্য ব্যবহৃত হবে। আর ঈমানওয়ালাদের আরামআয়েশের আসবাবসমূহ বাতিল সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হবে। আল্লাহ তা'আলা এক্বীনওয়ালাদের জন্য স্বীয় কুদরত ব্যবহার করে আসবাবের শেকেল পাল্টে দেন। লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেন। আগুনকে বাগানে পরিণত করে দেন। সমুদ্রকে রাস্তা বানিয়ে দেন।

সকল নবী-রাসূলগণের সাথে যত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাতে এগুলোই পাওয়া যাবে যে, এক্বীনওয়ালাদের জন্য পানি রাস্তায় পরিণত হয়ে

গিয়েছে, আর অস্বীকারকারীদের জন্য রাস্তা পানিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আসবাব বানিয়ে মানব জাতির হাতে দিয়ে দেননি বরং নিজ কুদরতে রেখে দিয়েছেন। একমাত্র ঈমানওয়ালারাই ঐ আসবাব দ্বারা উপকৃত হতে পারে। ঈমান ছাড়া ঐ খাযানা হতে উপকৃত হতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার খাযানা হতে উপকৃত হওয়ার জন্য কায়েনাত তথা মাখলূকাতের এক্বীন বের হওয়া শর্ত। আল্লাহ তা'আলার কুদরত হতে উপকৃত হওয়ার জন্য আসবাবের এক্বীন বের হওয়া শর্ত।

বিষয় এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে দোকান দিয়ে দিয়েছেন তো তাকে উপার্জনের ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন।

অথবা কাউকে জমি দিয়ে দিয়েছেন তো তাকে উৎপাদন ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন।

অথবা কাউকে হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছেন তো তাকে তা ব্যবহার করার ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন।

অথবা কাউকে স্ত্রী দিয়ে দিয়েছেন তো তাকে বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন।

কত লোক এমন আছে, যাদের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বাচ্চা নেই। কত অস্ত্রধারী লোক এমন আছে, সে শত্রুর ব্যাপারে পেরেশান ও অস্থির হয়ে আছে। কত লোক এমন আছে, যার নিকট ঢের ওষুধ থাকা সত্ত্বেও সে অসুস্থ। কত লোক এমন আছে, যাদের নিকট আসবাব থাকা সত্ত্বেও সে দরিদ্র ও অভাব অনটনের শিকার। না জানি কত লোক এমন আছে, যাদের দোকান আছে ঠিক, কিন্তু তার ঋণও পঁচাত্তর হাজার টাকা। অথচ তার দোকানে মাল আছেই পঞ্চাশ হাজার টাকার। অর্থাৎ বিষয় সেটাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোকান দিয়েও তাকে ঋণী বানিয়ে রাখেন।

তো মেরে দোস্তো! আল্লাহ তা'আলা কাউকে কুদরত দেননি। বরং দিয়েছেন আসবাব। আসবাবের মধ্যে কুরদত মোটেও নেই। যে ব্যক্তি মনে করবে, আসবাবের মধ্যেই কুদরত আছে সে তো জীবনে আসবাব বানাবে। আর যে একথা মনে করবে যে, কুদরত তো আল্লাহ তা'আলার জাতে আলীর মধ্যে নিহিত সে আল্লাহ তা'আলার জাতে আলী থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার আসবাব বানাবে। অর্থাৎ আমল বানাবে, সাজাবে ও সুন্দর

করবে। আল্লাহ তা'আলার কুদরত হতে ফায়দা উঠানোর একটি মাত্র পথ, আর তা হলো আমল বানাও। আল্লাহ তা'আলার কুদরত হতে ফায়দা উঠানোর উপকরণ আসবাব নয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলার কুদরত হতে ফসল নেয়ার জন্য জমি তৈরি করলাম তাহলে কি আর তাতে বন্যা বা খরা স্পর্শ করবে?

আমি আল্লাহ তা'আলার কুদরত হতে সন্তান নেয়ার জন্য স্ত্রী রাখলাম তাহলে কি আমার স্ত্রী বন্ধা হবে?

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! একটি হলো কুদরতের সাথে নেয়া। আরেকটি হলো আসবাবের সাথে নেয়া। আসবাবের সাথে নেয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কোনো ওয়াদা নেই। যদিও আসবাব সাময়িকভাবে কোনো উপকারে এসে থাকে ও সফলতা দিয়ে থাকে এরপর আবার চিরকালের জন্য অপকারই করে যায়, কোনো কাজে আসে না। কথা এটাই যে, হে বান্দাহ! তোমাদের মধ্য হতে যে দুনিয়া চাইবে সে চিরকালের জন্য নাকাম ও বিফল থাকবে। আর যে আখেরাত চাইবে আমি তাকে আখেরাতও দিব এবং সাথে সাথে দুনিয়াও দিয়ে দিব। হয়তো তার প্রয়োজন অনুযায়ী দিবেন বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে দিবেন। সুতরাং যে দুনিয়া প্রত্যাশা করবে তার আখেরাত নষ্ট হবে। এ জন্য মনে রাখুন! মেরে দোস্তো! আল্লাহ তা'আলার কুদরত কোনো আসবাবের মধ্যে নেই। অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্পর্ক কোনো আসবাবের সাথে নেই। যখন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্পর্ক কোনো আসবাবের সাথে নেই আর কুদরতও আসবাবের মধ্যে নেই তাহলে আমাদের এই সকল আসবাবের মেহনত সবই বেকার। বেকার কেন?

বেকার এ জন্য যে, কুদরত আমাদের খেলাফ। কুদরত আসবাব বানানেওয়ালাদের সাথে থাকে না যে, আসবাব বানাও তাহলে কুদরতও চলে আসবে। হ্যাঁ! লোকেরাতো একথাই বলে থাকে যে, আগে আসবাব বানাও এরপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবে। এটা তো উল্টো কথা। তারা আল্লাহ তা'আলাকে না চেনার কারণে তাদের মুখ হতে উল্টা কথা বের হচ্ছে।

একথা কুরআনের খেলাফ।

এ কথা হাদীসে রাসূলের খেলাফ।

যে, আগে তোমরা আসবাব বানাও এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছে চাও। কেন এমন? কেননা আসল কথাতো হলো, তোমরা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছে চাও। তার দেয়ার মাধ্যম কি? তাঁর দেয়ার নিয়ম-নীতি কি? তিনি বলেন,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

হে আল্লাহ! আমি তোমারই এবাদত করি আর তোমার নিকটেই সাহায্য চাই।

এটাই হলো তাঁর দেয়ার নিয়ম-নীতি। অর্থাৎ আমি তোমার নিকট হতে এবাদতের মাধ্যমে নিয়ে থাকি।

মেরে দোস্তো! একটি হলো কালিমার শব্দ। আরেকটি হলো এ কালিমার এখলাস।

কালিমার দাওয়াত হলো কালিমার এখলাস অর্জন করার জন্য। হাদীসের ভাষ্যও তাই, কালিমার এখলাস ছাড়া অন্য কিছু হারাম কাজ হতে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কালিমার এখলাস হলো, কালিমাই মানুষকে হারাম থেকে বিরত রাখবে। এটাই হলো কালিমার এখলাস। আর কালিমার এখলাস অর্জিত হবে কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে।

কালিমার দাওয়াতের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের ব্যাপক ভুল ধারণা হলো, কালিমার দাওয়াত তো অমুসলিমদের জন্য। আমরাতো কালিমা ওয়ালা আছিই। আর ভুল ধারণা এভাবে জন্ম নিয়েছে যে, স্বয়ং ঈমান ওয়ালাদের মধ্য থেকেই ঈমানের দাওয়াত খতম হয়ে গেছে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! ঈমানের দাওয়াত তো খোদ ঈমানওয়ালাদের জন্যই ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঈমান ওয়ালাদেরকেই ঈমান আনার জন্য আদেশ করেছেন। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا

হে ঈমানদ্বারগণ! ঈমান আনো

অমুসলিমদেরকে দিতে হবে ইসলামের দাওয়াত। আর মুসলমানদের ভেতরে দিতে হবে ঈমানের দাওয়াত। যখন স্বয়ং ঈমানওয়ালারা ঈমানের দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিল তখন ঈমান হাসিল করার ও কালিমার হাক্বীকত

হাসিল করার উপকরণ স্বয়ং ঈমানওয়ালাদের ভেতর থেকেই খতম হয়ে গেল। এখন তো এ মেহনতই খুব জরুরি যে, যাদেরকে ঈমান আনার হুকুম দেয়া হয়েছে তাদেরকেই ঈমানের দাওয়াত দেয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا

হে ঈমানওয়ালাগণ! তোমরা ঈমান আনো। কেমন ঈমান আনবে?

آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

যেমন সাহাবাগণ ঈমান এনেছে।

কেয়ামত নাগাদ আগত ঈমানওয়ালাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ দাওয়াত যে, তোমরা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মত ঈমান আনো। এটা এক বড় ধরনের ভ্রান্তি যে, ঈমানওয়ালারা ঈমানের দাওয়াতকে অমুসলিমের জন্য মনে করে বসে আছে। তাদেরকে বানানো হয়েছিল ঈমানের দায়ী তথা আহ্বায়ক হিসেবে, তারা তো এখন ঈমানের মুদ্দায়ী তথা দাবিদার হয়ে বসে আছে। ফলে তারা মনে করে দাওয়াত তো খতম হয়ে গিয়েছে। এখন ঈমানওয়ালাদের মধ্যে "দাওয়াত" এর স্থলে "দা'ওয়া (দাবি)" এসে গেছে।

আর যখন ঈমানের "দা'ওয়া" চলে এসেছে তখন প্রত্যেক মুসলমানই নিজ ঈমান সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত। প্রশান্ত চিত্তে বসা আছে। অথচ বাস্তব কথা হলো, ঈমান যতই অন্তরে আসতে থাকবে ততই তার অন্তরে ঈমানের বিষয়ে ভয়-ভীতি কাজ করতে থাকবে। নিফাকের আশঙ্কা বেড়ে যাবে। আর যতই ঈমান দুর্বল হতে থাকবে ততই সে নিজ ঈমান সম্পর্কে নির্ভিক ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে। ফলে মুনাফেকীর আলামতসমূহ তার দৃষ্টিতে উত্তম গুণ মনে হতে থাকবে।

মিথ্যা বলা তার কাছে ভাল মনে হবে।

খিয়ানত করা তার কাছে ভাল মনে হবে।

ওয়াদা খলাফ করা তার কাছে ভাল মনে হবে।

ওয়াদাখেলাফী করাকে তার কাছে বুদ্ধিমত্তার কাজ মনে হবে।

ওয়াদা খেলাফীকে বুদ্ধিমান বলে আখ্যা দেয়া হবে।

অর্থাৎ সাহাবাদের যুগে যেসব আলামত মুনাফিকের ছিল সে আলামতগুলোইএ যুগের ঈমানওয়ালাদের নিকট সৎ গুণ হয়ে যাবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত হানযালা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুনাফেকী কোনো কাজ করেননি যে, না মিথ্যা বলেছেন, না কোনো ওয়াদাখেলাফী করেছেন আর না খেয়ানত করেছেন। তারা এ জাতীয় কোনো কাজই করেননি। শুধু এতটুকু হয়েছিল যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে থাকাকালীন অন্তরের একীনের যে অবস্থা হয়ে থাকে বাড়ির পরিবেশে গিয়ে অন্তরের সেই অবস্থা পাচ্ছিলেন না। এতটুকুতেই তাদের এ শঙ্কা হলো যে, আবু বকর তো মুনাফেক হয়ে গেছে, হানাযালা তো মুনাফেক হয়ে গেছে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! হুকুম তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এই যে, ঐ ঈমান অর্জন কর যা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল। কিন্তু ঈমানের দাওয়াত বিদায় নেওয়ার কারণে নিরেট কালিমার বুলিই ঈমান হয়ে গিয়েছে। অথচ হারাম কাজ করেও তার মধ্যে এতটুকু অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে না যে, সে হারাম কাজ করছে। তার কাজটি হারাম বিষয় এমন নয় যে, তার এ জ্ঞান নেই যে, এটা হারাম। খুব ভাল করেই জানে যে, এটা হারাম। তবুও তা করে যাচ্ছে। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন আলামত যে, খারাফীকে খারাপ বলে মনে করা। হাদীসের ভাষণ হলো, এর পরে অন্তরে আর যাররা বরাবর ঈমানও বাকি থাকে না।

এটাই হলো ঈমানের সর্বশেষ স্তর যে, গুনাহকে গুনাহ মনে করা। হারাম কে হারাম জ্ঞান করা। সুতরাং যে হারামকেই হারাম মনে করলো না তার অন্তরে তো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরও বিদ্যমান থাকলো না। অতএব, সর্বাগ্রে একথা ভাবতে হবে যে, ঈমানের দাওয়াত স্বয়ং ঈমানওয়ালার জন্যই। এ আদেশই দেয়া হয়েছে এ আয়াতে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا

স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঈমানওয়ালাদের নিয়ে ঈমানের মজলিস কায়েম করতেন ও বলতেন, এসো, আমরা কিছুক্ষণ বসে ঈমান আনি।

মেরে মুহ্তারাম দোস্তো ও বুযুর্গ! ঈমান হলো যরফ আর অন্যান্য হুকুম আহকাম হলো মাযরূফ।

যরফ বলা হয় পাত্রকে।

মাযরূফ বলা হয় ঐ বস্তুকে যা পাত্রে রাখা থাকে।

যখন পাত্র থাকবে তখন বস্তু আর নষ্ট হবে না। আর যখন পাত্র থাকবে না তখন বস্তু নষ্ট হয়ে যাবে। ঈমান যেহেতু পাত্র তাই ঈমান ছাড়া হুকুম-আহকাম দ্বারা কোনো উপকৃত হওয়া যাবে না। কারণ ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরা হতেই পারে না।

কেউ আমল করলো কিন্তু আমলের মধ্যে তার কামিয়াবীর এক্বীন নেই, তাহলে আসবাব তার আমলে গাফলতী নিয়ে আসবে। আসবাব আমলের জন্য মাহরূমীর কারণ হবে। যদি আমল দ্বারা কামিয়াবীর এক্বীন না আসে তাহলে আমল থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হবে আসবাবের এক্বীন। একারণেই ভিত্তিগতভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ সর্বপ্রথম ঈমান শিখেছেন।

تعلّمنا الإيمان قبل تعلّمنا القرآن

আমরা কুরআন শিখার আগে ঈমান শিখেছি।

তারা যখন ঈমান শিখেছেন তখন যখনই কোনো হুকুম নাযিল হতো তৎক্ষণাৎ তা আমল পরিণত হয়ে যেত। হ্যাঁ! হুকুম কিতাবে আসেনি।

মেরে দোস্তো! শরীয়ত প্রয়োগের সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো প্রত্যেক ঈমানওয়ালার এক্বীন। প্রত্যেক ঈমানওয়ালার ঈমানই তার নেগরান। তার পর্যবেক্ষক। ঈমানের দাবিতেই সে একথা ভাববে যে, আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমার আল্লাহ এই আমলের উপর এই এই ওয়াদা করেছেন ও বদ আমলের উপর এই এই ধমক দিয়েছেন। ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরা হতে পারে না এবং পারে না এহতেসাব অনুযায়ী আমল হতে। কারণ ঈমান অনুপাতেই এই এহতেসাব আসবে যে, আল্লাহ তা'আলা এই আমলের উপর এটা দিবেন ও এই আমল ছেড়ে দেয়ার দরুন এই এই শাস্তি দিবেন। এরপর দেখুন! সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহ তা'আলার খাযানা হতে সরাসরি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই ঈমান ঈমানের দাওয়াতের মাধ্যমেই বনে থাকে। কিন্তু হলো কি? ঈমানের দাওয়াত ঈমানওয়ালাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

একথা ভেবে যে, আমরা তো ঈমানদার আছিই। কালিমার দাওয়াত তো অমুসলিমদের জন্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো।

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

সাহাবাগণ যেমন ঈমান এনেছেন ঐরূপ ঈমান তোমরা আনো।

সুতরাং সাহাবাদের ঈমানের প্রতি দাওয়াত।

আর সাহাবাদের ঈমানের জন্যই মেহনত।

সাহাবাদের ঈমানই হলো আসল কাম্য ঈমান।

আমরা আমাদের ঈমানের উপর কেন সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছি? এ জন্য যে, আমরা আমাদেরকে অমুসলিমদের বিপরীতে দেখতে পাচ্ছি। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হয়েছে সাহাবাদেরকে নমুনা বানিয়ে।

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

তোমরা ঈমান আনো সাহাবাদের ঈমানের মত। তাহলেই এই এই সাহায্য, এই এই সহায়তা তোমরা প্রাপ্ত হবে। এই ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা পুরা করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষেত্রে পুরা করেছেন। অতঃপর যার ঈমান ও এক্বীন এগুণের সাথে যত বেশি শক্তিশালী হবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তার সাথে তত বেশি পুরা হবে। কারণ,

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তাঁর হুকুমের সাথে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তাঁর ওয়াদার সাথে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার কুদরত আসবাবের সাথে নয়।

আসবাব তো কুদরতের মাধ্যমে বনবে।

বিষয় এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আসবাব বানিয়ে মানব জাতির হাওয়ালা করে দিয়েছেন। এখন তো আমরা আল্লাহ তা'আলা ও আমাদের মাঝে আসবাবকেই আসল বানিয়ে নিয়েছি যে, স্বয়ং ঈমানওয়ালারাও আসবাবের মাঝে কামিয়াবি ও সফলতা তালাশ করা শুরু করেছে।

এ পথ নাকামী ও বিফলতার পথ।

আল্লাহ তা'আলার কুদরত ঈমানওয়ালাদের সাথে আমালের উপর একীন করার সাথে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার কুদরত আসবাবের সাথে নয়। যেমন এখন লোকেরা আসবাব বানিয়ে দু'আ করে থাকে।

ব্যবসায়ীদের মাথায় এ কথা বসে আছে, দোকান বানানো আমার দায়িত্বে। এতে আল্লাহ তা'আলা সফলতা দিবেন।

জমিদারদের মাথায় একথা বসে আছে, জমি বানানো আমার দায়িত্বে। তাতে সফলতা আল্লাহ তা'আলা দিবেন।

ডাক্তারের মাথায় এ কথা বসে আছে, ওষুধ বানানো ও চিকিৎসা করা আমার দায়িত্বে। সুস্থতা তো আল্লাহ তা'আলা দিবেন।

মেরে দোস্তো বুযুর্গ! যদি এ কথাগুলোকে অস্বীকার করা হয় তখন আপনাদের অবাক লাগবে যে, দেখো! আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কামিয়াব করার জন্য নাকি এ আসবাব নয়। এ অবাক হওয়া এ জন্য যে, বারংবার আমরা আসবাবের কথা বলছি, বারবার শুনছি ও শুনে আসছি যে, আল্লাহ তা'আলা আসবাব বানিয়েছেন। তাই এ আসবাব গ্রহণ করার পর আল্লাহ তা'আলার কাছে কামিয়াবী চেয়ে নাও।

না, বিষয়টি কখনো এমন নয়।

এটা কামিয়াবির রাস্তা মোটেও নয়। আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদাকে আসবাবের সাথে করেনি। আল্লাহ তা'আলা যতগুলো আসবাব বানিয়েছেন তার সব ক'টি আসবাবই ঈমানওয়ালাদের পরীক্ষার জন্য এবং অমুসলিমদের চিত্ত-প্রশান্তির জন্য।

যদি দুনিয়াভর কোথাও কোনো আসবাব না থাকতো তাহলেও ঈমানদার লোকেরা একথা বলতো যে, আমাদের প্রয়োজন আমাদের আল্লাহই পূরণ করবেন। কারণ, পালনেওয়ালা জাত তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

মেরে দোস্তো! আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আসবাব বানিয়েছেন। এই সব ধরনের আসবাব কুদরত দ্বারা তৈরী হয়েছে। আর কুদরত হলো তার জাতের ভিতরে কুক্ষিগত। আল্লাহ তা'আলা কুদরতকে আসবাব বানানোর

পর তাকে আসবাবের মধ্যেই রাখেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আসবাব বানিয়ে তাতে কুদরতও দিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি এমন নয়।

অতএব, কথা এমন নয় যে, আসবাব বানানো আমাদের কাজ আর তাতে কামিয়াবী ও সফলতা দেয়া আল্লাহ তা'আলার কাজ। বরং কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুম পুরা করা আমাদের কাজ আর কামিয়াব করা না করা আল্লাহ তা'আলার কাজ। চাই তিনি আসবাব দেন বা না দেন। এটা তার ইচ্ছা। এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় খাযানা হতে উপকৃত করার জন্য দুনিয়ার এ কারখানা বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন ব্যবসায়ীদের ধারণা হলো, দোকান আমি বানাবো আর তাতে কামিয়াবী আল্লাহ তা'আলা দিবেন।

আজ পুরো দুনিয়াতে এই একই কথা চলে আসছে। আমাদের সাথীগণ যারা দাওয়াত ইলাল্লাহ-এর কাজ করে যাচ্ছেন তারা দুনিয়াভর এ কথাই চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো অবাক লাগে যখন আমাদের সাথীরাও এ কথা বলে যে, ভাই! দুনিয়া তো দারুল আসবাব (আসবাবের ঘর)। তাই দোকানও জরুরি। ব্যবসা-বাণিজ্য করাও জরুরি। চাকরি-বাকরি করাও জরুরি। ক্ষেত-খামার করাও জরুরি। এগুলো করার পর আল্লাহ তা'আলাতো মানুষকে আসবাবের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন, আর কামিয়াবী আল্লাহ তা'আলার হাতে রেখেছেন।

কখনো বিষয়টি এমন নয়। বরং মেরে দোস্তো! কামিয়াবী দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম-নীতি হলো তার হুকুম-আহকাম।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে ঐ একীন শিখিয়েছেন যেই একীনের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার সাথে ধারনা হয় তার ওয়াদা অনুপাতে যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা আমাদের সাথে এমন এমন। সাহাবায়ে কেরামগণকে একীনী আসবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

কী শিখানো হয়েছে?

শিখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি এহতেমামের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার...

* রিযিকের সংকীর্ণতা দূর করে দিবেন।

* তার অসুস্থতা দূর করে দিবেন।

* তাকে সুস্থ করে দিবেন।

* তার চেহারাকে নূরানী করে দিবেন।

অথবা যে ব্যক্তির ঘরে সূরায়ে ওয়াকি'আহ পাঠ করা হবে ঐ ঘরে কখনো দারিদ্র স্পর্শ করবে না।

অথবা যে ব্যক্তি স্বহস্তে দান-সদকা করবে তার অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে। সত্তুরটি বালা-মুসিবত হতে মুক্ত থাকবে।

যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ পাঠ করবে তার উপর কোনো বিপদ আসবে না। দু'আটি হলো–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ থেকে اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

মেরে মুহ্তারাম দোস্তো, বুযুর্গ! ঈমানওয়ালারা যখন এক্বীনী আসবাবের শিক্ষা অর্জন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জানের উপর, মালের উপর এবং সন্তান-সন্ততির উপর পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন সমস্যা দান করবেন। এটা পরখ করে দেখার উদ্দেশ্যে যে, তাদের এক্বীন কি আসবাবের উপর, না আহকামের উপর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরখ করে দেখতে থাকবেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ঈমানের মু'আল্লিম (শিক্ষক) ও ঈমানের মুমতাহিন (পরীক্ষক)। তিনি সাহাবাদেরকে ঈমান শিক্ষাও দিচ্ছিলেন এবং তাদের থেকে পরীক্ষাও নিচ্ছিলেন।

এক সাহাবীর পরীক্ষা নিয়েছেন। হ্যাঁ! যাকে ঈমান শিখিয়েছেন তার থেকেই ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

كَيْفَ اَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ

হে হারেসা! কিভাবে সকাল করলে?

উত্তরে তিনি বললেন–

اَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا

আমি ঈমানের হাক্বীকতের সাথে সকাল করেছি।

অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যেক কথার একটি হাক্বীকত থাকে। প্রত্যেক দাবির পেছনে একটি দলিল থাকে, তোমার এ কথার পেছনে হাক্বীকত ও দলিল কী?

উত্তরে হযরত হারেসা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, (যার সংক্ষেপ হলো) ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমার যত রুজি আসমান হতে অবতীর্ণ হচ্ছে, আর তাতে পানির যত বিন্দু-কণা রয়েছে, যত শস্য দানা রয়েছে এগুলোর সাথে যত ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হচ্ছে আমি তার সকলকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারছি। তাদের গমনাগমন অবলোকন করতে পারছি। অতঃপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে হারেসা! তুমি ঈমানের হাক্বীকত স্পর্শ করতে পেরেছো। এখন তুমি এর উপর জমে থাকো।

এখন দুনিয়ার সকল লোক এসে একথা বলছে যে, সেখানে এটা হয়েছে ওখানে ওটা হয়েছে/হচ্ছে, ঐ স্থানে আগুন লেগে গেছে, সেখানে তোমার বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, আর তিনি এক স্থানে বসেই বলে দিচ্ছেন যে, না আমার বাড়ি পুড়েনি।

মেরে মুহতারাম দোস্তো! যারা এ পুড়ে যাওয়ার খবর এনেছেন তাদের এ খবর এক্বীন করার নয়। এ খবর শুছিলেন হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তার সাথে আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা ছিল যে, যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়ে নিবে কখনো তার কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হবে না। এরপর তিনি দু'আ পড়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তার ঘর কিভাবে পুড়িয়ে ছাই করতে পারেন। এটা তো কখনও হতে পারে না।

কারণ, ওয়াদাখেলাফী মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রমাণ। আর যে মুখাপেক্ষী হবে সে কখনও খালেক হতে পারে না। মুখাপেক্ষী তো মাখলূক হয়ে থাকে। মাখলূক তো সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণে খালেকের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা তো খালেক। তাই তিনি মুখাপেক্ষীতা হতে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতের মধ্যে কোনো সববকে সৃষ্টি করার পর তাকে কুদরত হতে বের করে দেননি। প্রত্যেক সববই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ভেতরে রয়েছে। এখানে বিষয় এটা নয় যে, বলনেওয়ালা কী বলছে। বরং বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে কী ওয়াদা করেছেন। তিনি তো ওয়াদা করেছেন আমার উপর কোনো ধরনের বিপদ আপদ আসবে না। সুতরাং আসলেও আমার উপর কোনো বিপদ আসবে না। এখন হযরত আবু সারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সংবাদদাতার

সংবাদকে কিভাবে বিশ্বাস করে নিবেন। তাঁর সাথে তো আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার ধারণা অনুপাতে তার সাথে ব্যবহার করে থাকেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে যেমন ধারণা করেছেন আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে তেমনি ব্যবহার করেছেন।

যেহেতু আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ধারণা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর ছিল তাই চাই ঘর পুড়ে যাওয়ার খবর এক জন দিক বা দশ জন, এতদসত্ত্বেও তার ঘর পুড়ে যেতে পারে কিভাবে?

মেরে মুহ্তারাম দোস্তো বুযুর্গো! ঈমান বলাই হয় আল্লাহ তা'আলার দেয়া খবর কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ভরসা করার ভিত্তিতে এক্বীনি ভাবে মেনে নেয়া।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

এর অর্থ এটাই যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যতগুলো খবর নিয়ে এসেছেন তার সবকটি খবরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভরসায় এক্বীনিভাবে মেনে নেয়া।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

এর সারাংশই হলো, তার আনীত সকল খবরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভরসায় এক্বীনিভাবে মেনে নেয়া।

এই এক্বীন অর্জন করতে হবে দাওয়াতের মাধ্যমে। এই এক্বীন বনবে কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবীকেই কালিমার দাওয়াতের উপর উঠিয়েছিলেন। সেখানে ঈমানের মজলিস কায়েম হতো।

মেরে দোস্তো আযীযো বুযুর্গ! বর্তমানে দুনিয়াতে যত ধরনের মজলিস কায়েম হচ্ছে তার সবগুলোই আসবাবের ভিত্তিতে কায়েম হচ্ছে। আসবাবের বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে কায়েম করা হচ্ছে। এ সকল মজলিস দ্বারা না কখনো এক্বীন বনেছে না কখনো ভবিষ্যতে বনবে। ঈমান হাসিল করার জন্য তো ঈমানের মজলিস কায়েম করতে হবে। ঈমান হাসিল করার জন্য তো ঈমানের মজলিস কায়েম করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মজলিসের মত। যে মজলিসে আলোচনা হচ্ছিল...

গায়েবী নেযামের আলোচনা
কুদরত ও রুবূবিয়তের আলোচনা।
কবরের তিনটি প্রশ্নের আলোচনা।
আল্লাহ তা'আলার করার নিয়ম-নীতি
আল্লাহ তা'আলার কুদরত আসবাবের মধ্যে নেই।
আল্লাহ তা'আলার কুদরত তাঁর ওয়াদার সাথে সম্পৃক্ত।
আর কুদরত আল্লাহ তা'আলার জাতে রয়েছে।
আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তাঁর হুকুমের মধ্যে সুপ্ত।
হুকুম পুরা করার সম্পর্ক এক্বীনের সাথে।
আর এক্বীন বানানোর জন্য মাখলূকাতের এক্বীন বের করা প্রথম শর্ত।

প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে ও প্রত্যেক মজলিসের শুরু ও ভিত্তি ঐ আলোচনা দ্বারাই করা চাই। হয়তো আমরা তার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি নয়তো ঐ দাওয়াতী কথাগুলো ভেবে যাচ্ছি। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছিলেন, আসো, বসো কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।

জনৈক সাহাবী এ অভিযোগ নিয়ে এলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা শুধু এ দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে যে, এসো, বসো, ঈমান আনি। তাহলে কি আমরা ঈমান আনয়ন করিনি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, না; বিষয়টি এমন নয়, বরং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সকলকে ঈমানের মজলিস কায়েম করতেন। ঈমানের মজলিসকে পছন্দ করতেন। সাহাবাদের যমানায় এ জাতীয় ঈমানী মজলিস কায়েম করা হতো।

কেননা, মেরে দোস্তো! দাওয়াতের বৈশিষ্টই হলো এক্বীন বানানো। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কালিমার দাওয়াত ব্যাপক পরিসরে না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে কালিমার এক্বীন অর্জিত হবে না। কারণ, কালিমার দাওয়াত আল্লাহ তা'আলার গায়েরকে নফী করে। কালিমার দাওয়াত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জাতকে দাবি করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কালিমা দাওয়াতে না আসবে, এ কালিমা মুজাহাদায় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কালিমার হাক্বীক্বত হাসিল করা কঠিন।

যেহেতু মেহনত চলছে আসবাবের, তাই অন্তরে আসবাবই বদ্ধমূল হয়ে আছে। মেহনত যে বস্তুর হবে একীন সে বস্তুরই হবে। আর যে বস্তু দাওয়াতে আসবে সেটাই একীনে আসবে। এ কারণেই মুজাহাদা দ্বারা মুকাশাফা হয়ে থাকে। যেটাই মানুষের বুঝে এসে থাকে ঐ লাইনে মেহনত-মুজাহাদা করার দ্বারা সেটাই অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই যেটাই মানুষ বুঝে থাকে সেটাই ক্রমে ক্রমে মানুষের একীনে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু যে কোনো বস্তু যখন বুঝে আসা শুরু হয় তখন ঐ ব্যাপারে সন্দেহও আসতে শুরু হয়। আর এটাই হলো একীন আসার আলামত। বুঝ ও সন্দেহের মাঝে দ্বন্দ্ব হতে থাকবে। এরপর যতই মেহনত-মুজাহাদা হতে থাকবে ততই সন্দেহ-সংশয় দূর হতে থাকবে ও বুঝে আসা বস্তু একীনে পরিণত হতে থাকবে।

যদি কালিমা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

-এর দাওয়াত এবং এ লাইনের মুজাহাদা না হবে তাহলে মানুষ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

এর শুধু শব্দের মধ্যই যথেষ্ট মনে করে বসে থাকবে।

এটা যদি মুখে থাকে তাহলে এটা শব্দ।

যদি দেমাগে থাকে তাহলে এটা মাফহুম বা মর্ম।

যদি কানে আসে তাহলে এটা তার আওয়াজ।

আর যদি তা কিতাবে থাকে তাহলে এটা তার হরফ বা বর্ণ।

মেরে মুহতারাম দোস্তো বুযুর্গ! কালিমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ যখন তার একীনের সাথে বের হবে এবং তা দিলের ভেতরে প্রবেশ করবে তখনই এটা দিলের কালিমা হয়ে যাবে। তখনই এ ঈমান তাক্বওয়া নিয়ে আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা দিলে বদ্ধমূল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারামের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হারাম থেকে বাঁচতে পারবে না। উম্মত হালাল-হারাম সম্পর্কে জানে না, কথা তা নয়। সবই জানে। কিন্তু তা অন্তরে বদ্ধমূল না হওয়ার কারণে তার মধ্যে হারাম থেকে বাঁচার শক্তি আসে না। অন্তরে ঈমান আসার আলামত হলো, ঐ ঈমান ঈমানওয়ালাকে হারাম কাজ হতে বাঁচাবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিসে জনৈক সাহাবী অন্য এক সাহাবীর গীবত করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কুরআনের সাথে খেল-তামাশা করছো? ঐ সাহাবী বললেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুরআনের সাথে খেল-তামাশা করছি না। আমি তো কুরআনের উপর ঈমান এনেছি। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ঐ ব্যক্তি কুরআনের উপর ঈমান আনেনি যে নিজ আমল দ্বারা কুরআনের হারামকে হালাল প্রমাণিত করছে।

এ কথা নয় যে, হারাম কে হরাম বলে জানে না। বরং প্রশ্ন তো হচ্ছে আমলের।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! এলম তো রাহবরী করবে মাত্র। আর একীন তাকে আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। এলম বলে দিবে যে, এটা হালাল, এটা হারাম। এটা সুন্নত, এটা বিদআত। এটা শিরক, এটা কুফুরী। এটা জায়েয, এটা না জায়েয। কিন্তু ঐ এলমের উপর উঠাবে কে? ঐ এলেম অনুযায়ী চালাবে কে। হারাম থেকে বাঁচাবে কে?

সেটাই হলো অন্তর্নিহীত শক্তি। এ শক্তি ছাড়া অন্য কোনো শক্তি এমন নেই যা মানুষকে শরীয়তের হুকুম-আহকামের উপর উঠাবে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! হুকুমত তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মানুষকে শরীয়তের উপর চালায় না। শরীয়তের উপর চালায় তার ভেতরের একীন। তার একীনই এ তাকাযা করবে যে, আমার রব এই মুহূর্তে কী চাচ্ছে। সর্বপ্রথম তো ঈমানওয়ালাদের থেকে কোনো গুনাহের কাজই প্রকাশ পেতে পারে না। যদি ঈমানওয়ালাদের থেকে প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে তার ঈমানই তাকে পরিষ্কার করবে। এক সাহাবী ছিলেন। তার দ্বারা যিনা সংঘটিত হয়ে গেল। তিনি নিজেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে ধরা দিলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার থেকে যিনার মত জঘন্য অপরাধ প্রকাশ হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে একদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যে দিকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়েছেন। সাহাবী সে দিকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার থেকে যিনার মত জঘন্য অপরাধ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি বারংবার এটাই চাচ্ছিলেন যে, যে কোনোভাবে বিষয়টি মিটে

যাক। সে আর সামনে না বাড়ুক। কিন্তু ঐ সাহাবী বারংবার বলে যাচ্ছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার থেকে যিনার মত জঘন্য অপরাধ প্রকাশ পেয়েছে। এবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি ভাল করে জানা আছে যে, আসলেও যে তুমি যিনা করেছো? সাহাবী উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ আসলেও আমি যিনা করেছি।

সাহাবীর এই দশা হলো কেন? এটা তার অন্তরে ভেতরের ঈমানী শক্তির বলে হচ্ছে। তার ঈমান বারংবার তাকে আদেশ দিচ্ছে যে, দুনিয়াতেই পাক হয়ে যাও তাহলে আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তি হতে বেঁচে যাবে।

মেরে দোস্তো! আচ্ছা! ঐ সাহাবীকে যিনা করতে কে দেখেছে? কেউ নয়। তিনি তো নিজে নিজেই এসে ধরা দিলেন। নিজে নিজেই এসে নিজ যিনার অপরাধের কথা স্বীকার করলেন।

অনুরূপভাবে এক চোর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট এসে বলতে লাগলো, আমীরুল মু'মিনীন! আমি উট চুরি করেছি।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, না, তুমি হয়তো উটটিকে নিজের ভেবে তার দড়ি খুলেছো।

চোর বলল, না। বরং আমি চুরিই করেছি। অন্যের জেনেই চুরির নিয়তে তার দড়ি খুলেছি।

মেরে মুহ্তারাম দোস্তো বুযুর্গো! তখন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হতো, তার ফলে মানুষের অন্তরে এমন এক্বীন জন্মেছিল যে, মানুষ গুনাহ করার সাথে সাথে অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে যেত।

কারণ, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি নেক আমল দ্বারা খুশি হল এবং বদ আমল দ্বারা চিন্তিত হয়ে গেল। এটাই তার ঈমানের প্রকৃত আলামত। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করার পর খুশি হলো না এবং খারাপ কাজ করার পর চিন্তিত হলো না এটা তার মুনাফেক হওয়ার আলামত।

তো মেরে দোস্তো, আযীযো, বুযুর্গো! প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ঈমানকে মেপে দেখতে পারে।

নিজের আমল দেখে নিল।

নিজের এক্বীন দেখে নিল।

যখন ঈমানের পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে তখন গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ করার পর নিজেই অপরাধী হিসেবে নিজেকে ধরা দিবে। শাস্তির জন্য পেশ করে দিবে। এমন নয় যে, এটা শুধু সাহাবাদের যমানার সাথেই খাস ছিল। এমন মনে করা হচ্ছে বলেই এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে যে, আমরা তো আসবাব বানাবো এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কামিয়াব করবেন। আল্লাহ তা'আলা তো আসবাব বানানোর পর তাদেরকে কামিয়াব করবেন যাদেরকে তিনি তার হুকুম আহকাম দেননি। আর তাদেরকে আসবাবের মধ্যে ততদিন পর্যন্ত কামিয়াব করবেন যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের দাওয়াত না আসবে। যে দিন মুসলমানদের মধ্যে হক্বের দাওয়াত চলে আসবে সে দিনই আল্লাহ তা'আলার বাতেলকে নাকাম করে দিবেন। সুতরাং এ কথা কখনও ঠিক নয় যে, আমরা প্রথমে আসবাব বানাবো এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করব। ফলে তিনি আমাদেরকে কামিয়াব করবেন।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আসবাবের মধ্যে কামিয়াবী দেয়ার উপকরণ আসবাব নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট আসবাবের মধ্যে কামিয়াবী দেয়ার উপকরণ হলো তার হুকুম পুরা করা। তোমরা আমার হুকুমকে পুরা করো তাহলে আমি তোমাদেরকে কামিয়াব করবো। চাই আসবাব দিয়ে হোক বা না দিয়ে। সরাসরি কুদরত দিয়ে হোক অথবা মুজিযা দেখিয়ে হোক বা কারামাত প্রকাশ করিয়ে হোক। নবীদের থেকে মুজিযা প্রকাশ এবং উম্মত থেকে কারামাত প্রকাশ করা যাহেরের খেলাফ। এতে আসবাবের কোনো দখল নেই।

যাহেরের খেলাফ হওয়া এর সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কুদরতের সাথে আর কুদরতের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাসমূহের উপর এক্বীন করার সাথে। আসবাবের সাতে কুদরত নেই। আসবাব হলো, কাম হলো না, এটা তো সম্ভব। কিন্তু কুদরত সাথে থাকা সত্ত্বেও কাম হলো না তা তো হতেই পারে না।

অতএব, মেরে দোস্ত বুযুর্গো! খুব ঠাণ্ডা মথায় ভেবে দেখুন যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে কোন্ জিনিস নিয়ে পেশ হতে হবে। আসবাব বানিয়ে এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে হবে না, আমল বানিয়ে এর পর দু'আ করতে হবে। মেরে দোস্তো! দু'আর সম্পর্ক আসবাবের সাথে নয় যে, আসবাব বানাও এরপর দু'আ করো। দু'আর সাথে আসবাবের কোনো সম্পর্ক নেই। দু'আ তো কবুল হবে আ'মালের সাথে। আসবাবের সাথে নয়। স্মরণ করুন, যারা গুহায় আটকে গিয়েছিল, বিশাল পাথর তাদের গুহার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল পেশ করলো। এর মধ্যে এবাদতগত, একজনের আমল ছিল মুয়ামালাতগত এবং আরেক জনের আমল ছিল মু'আশারাতগত। তিনো জন আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজ নিজ আমল পেশ করলো।

একজন বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমার ভয়ে ভীত হয়ে ও তোমাকে খুশি করতে গিয়ে এহসান করেছি।

অপরজন বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমার ভয়ে যিনা হতে বিরত থেকেছি।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে খুশি করার লক্ষ্যেই বিবি-বাচ্চার হক পেছনে ফেলে পিতা-মাতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছি।

সুতরাং আমাদের এ গুহা থেকে বের হওয়ার রাস্তা বানিয়ে দিন। বিপদ হতে মুক্তি দিয়ে দিন। তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে আমল বানিয়ে পেশ করেছেন। আসবাব বানিয়ে নয় যে, একটি ক্রেন বানিয়ে আল্লাহকে দিয়ে বলছেন, এ পাথরখানা গুহার মুখ থেকে উঠিয়ে দাও।

না, বরং আমল বানিয়ে পেশ করেছেন। ফলে তাদের আমলের উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তা'আলা কোনো যাহেরী শেকল তথা বাহ্যিক উপায় উপকরণ ছাড়াই নিজ হুকুম দ্বারা ঐ পাথরকে সরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, মেরে দোস্তো! যখন কুদরত সাথে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলার আদেশ সরাসরি হতে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট আসবাব চাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। আর যখন এক্বীন তৈরি হয়ে যায় তখন বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট সরাসরি চাইতে থাকে। তখন আল্লাহ রব্বুল

ইয্যত সরাসরি তার প্রয়োজন মিটাতে থাকেন। যেমনটি হয়েছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের বেলায় কী করেছিলেন?

আগুনকে সরাসরি আদেশ দিয়েছিলেন, ঠাণ্ডা হয়ে যাও। এমন নয় যে, পানি পাঠিয়েছেন। মেরে দোস্তো! লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা যেই আসবাব বানিয়েছেন তিনি সেই আসবাব ব্যবহারে বাধ্য নন। আমরা মনে করে থাকি যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরত হয়তো নতুন কোনো আসবাব নিয়ে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা আজও কোনো আসবাব ব্যবহারে বাধ্য নন। আল্লাহ তা'আলা তো সরাসরি আসবাবের উপর হুকুম ব্যবহার করে থাকেন।

ফেরাউনের খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় ইত্যাদির উপর সরাসরি ব্যাঙ ও রক্ত আসার হুকুম ব্যবহার করেছেন।

হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের কওমের জন্য সরাসরি পাহাড় হতে উষ্ট্রি বের হয়ে আসার হুকুম করেছেন।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পাঁজরের উপর সরাসরি হুকুম করেছেন হাওয়া আলাইহিস্ সালামকে বের করতে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের জন্য আগুনের উপর সরাসরি নিজ হুকুম ব্যবহার করেছেন যে, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও।

এমন করেননি যে, আগুন নিভানোর জন্য পানি পাঠিয়েছেন বা কোনো ক্যামিকেল ব্যবহার করেছেন। বরং তাকে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে আগুনকে সরাসরি হুকুম করেছেন। এর কারণ হলো....

মেরে দোস্তো! এক্বীনওয়ালা তার ও তার রবের মধ্যখানে কোনো আসবাবকে স্থান দেয় না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেন। অথবা ইসরাফীল ও মিকাঈল আলাইহিস্সালামের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেন বা সমুদ্রের ফেরেশ্তার মাধ্যমে বা বাতাসের ফেরেশ্তার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যে আল্লাহ তা'আলার নিকট আসবাব চাননি বিষয়টি শুধু

এতটুকুই নয় বরং এক্বীনি সবব এবং খুব শক্তিশালী উপকরণ ছিলেন– তাকেও পাঠাতে বলেননি। কারণ, তিনিও তো আল্লাহ তা'আলার গায়ের বা মাখলূক।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, হযরত জিবরাঈল্ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যখানে বহুতই আস্থাশীল ফেরেশ্‌তা ছিলেন। বহুতই আস্থাশীল দূত ছিলেন। কিন্তু এখানে বিষয় হলো এক্বীনের। এখানে বিষয় ছিলো ঈমানের অগ্নিপরীক্ষার। আল্লাহ তা'আলা তো নবীদের থেকেও ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আর তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে সাহাবাদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে ঈমান শিখাচ্ছেন এবং ঈমানের পরীক্ষাও নিচ্ছেন।

তিনি সাহাবাদের শিক্ষক এবং পরীক্ষকও।

তাই তিনি সাহাবাদেরকে ঈমান শিখাচ্ছেন এবং ঈমানের পরীক্ষাও নিচ্ছেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা ছিল। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে তাঁর নিকট পাঠিয়েছেন যে, তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, সে কী চায়? আমার নিকট তো বাতাসের ফেরেশ্‌তাও আছে, পানির ফেরেশ্‌তাও আছে। এখন আপনার যা ইচ্ছা আদেশ দিতে পারেন। আমি খোদ জিবরাঈল। আমার সাহায্যও আসতে পারে না। অতএব, আপনি আমাকে বলুন, আপনি আমার থেকে কোন্ ধরনের সাহায্য চান?

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বললেন–

أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا

আমার আপনার কোনো প্রয়োজন নেই।

মেরে দোস্ত বুযুর্গো! যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার গায়ের দিল থেকে বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার কুদরত তার পক্ষে ব্যবহার হবে না।

আসবাব সাথে থাকাও একটি পরীক্ষা।

আবার আসবাব একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও একটি পরীক্ষা।

আবার আসবাব দ্বারা কাজ হয়ে যাওয়াও আরেকটি পরীক্ষা।

আবার এটাও নয় যে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আসবাব দ্বারা কাজ হতে থাকবে। কারণ, আসবাব তো আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্য বানিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পেটে ব্যথা দিলেন।

মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে আল্লাহ! পেটে ব্যথা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, যাও রায়হানের ঔষুধ ব্যবহার করো। রায়হান একটি ভেষজি দ্রব্য। তাই তিনি রায়হান ব্যবহার করলেন। ব্যথা ভাল হয়ে গেল। এর কিছু দিন পর তাঁর পেটে আবারো ব্যথা দেখা দিল।

এখন আমরাতো মনে করি যে,

অসুস্থতা আমার মধ্যে এসেছে, শিফা দিবেন আল্লাহ তা'আলা।

ক্ষুধা আমার মধ্যে এসেছে, খানা দিবেন আল্লাহ তা'আলা।

ভয়-ভীতি আমার মধ্যে জন্ম নেয়, নিরাপত্তা দেন আল্লাহ তা'আলা।

মেরে দোস্তো! বিষয় এমন নয়।

যেমন শিফা আল্লাহ তা'আলার খাযানার একটি, অসুস্থতাও আল্লাহ তা'আলার খাযানার একটি।

যেমন খানা আল্লাহ তা'আলার খাযানার একটি, ক্ষুধাও আল্লাহ তা'আলার খাযানার একটি।

যেমন নিরাপত্তা আল্লাহ তা'আলার খাযানার একটি, ভয়-ভীতিও আল্লাহ তা'আলার খাযানার একটি।

পানির খাযানা, বাতাসের খাযানা সবই আল্লাহ তা'আলার খাযানা। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুরই খাযানা রয়েছে। এমন নয় যে, তোমাদের মধ্যে প্রয়োজন এমনি এমনিই পয়দা হয়ে যায় আর তা পুরা করার খাযানা আমার কাছে।

তো ভাই! আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পেটে ব্যথা পাঠালেন, এরপর বললেন, যাও, রায়হান নামক ভেষজ দ্রব্য ব্যবহার কর। ব্যবহার করলেন, ফলে ভালও হয়ে গেলেন। এতে কী হলো। একটি অভিজ্ঞতা হলো।

কার অভিজ্ঞতা হলো?

একজন নবীর অভিজ্ঞতা হলো যে, রায়হান দ্রব্য দ্বারা পেট ব্যথা ভাল হয়ে যায়।

আমরাও এমন হাজারো অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকি। অভিজ্ঞতার আলোকে আসবাব বানিয়ে ফেলেছি। কসম খোদার! দুনিয়ার সকল নেযাম মিথ্যা। আল্লাহ তা'আলা তো পরীক্ষা করার জন্য নিজ কুদরত দ্বারা আসবাবের মধ্যে কামিয়াবি দিয়ে রাখেন। এরপর প্রত্যেক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আসবাবের শেকেল ও সুরতকে পরিবর্তন করছেন। তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেও বদলে দিচ্ছেন।

দুনিয়ার সকল ডাক্তার,

দুনিয়ার সকল চিকিৎসক,

কসম খোদার! সবাই মিথ্যা ও ধোঁকায় পড়ে আছে।

সকলেই পরীক্ষাতে ফেঁসে আছে। এ পরীক্ষা হতে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই একমাত্র ঈমানের দাওয়াত ছাড়া। দাওয়াত না থাকলে সকলেই পরীক্ষায় ফেঁসে থাকবে। দেশ ভরা হাজারো ফার্মেসী। ঔষধ ভরা। হঠাৎ মাঝে মধ্যে ঔষধ নদীতে ভাসিয়ে দিতে হয়।

কারণ কী?

কারণ হলো, এক্সপেয়ার ডেট হয়ে গিয়েছে। ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, দেশের কোথাও এ ওষুধ বিক্রি করা যাবে না। যে ডাক্তার এ ওষুধ বিক্রি করবে তাকেও গ্রেফতার করা হবে। হাজতে দেয়া হবে। এখানে বিষয় কি? এক সময় তো এ ওষুধ খুব চলতো। এখন চলছে না কেন? কারণ এখন এ ওষুধ খুবই ক্ষতিকর।

মেরে দোস্তো! আমরা এখনো কুদরতকে বুঝতে পারিনি। এখনও তো আমরা কুদরতকে আসবাবের মধ্যেই মনে করছি যে, এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরত, ওটা আল্লাহ তা'আলার কুদরত। না, কুদরত আসবাবের মধ্যে নয়। কুদরত তো হলো আল্লাহ তা'আলার জাতের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা কুদরত দ্বারা আসবাব বানিয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল মাখলূকাতকে কোনো আকার আকৃতি ছাড়াই বানিয়েছেন। তিনি আসবাবের এ শেকেলের মধ্যে কুদরত রাখেননি।

তো ভাই! আমাদের অভিজ্ঞতাতে তো, শুধু আসবাবই নযরে আসে। তাই আমরা আসবাবের দিকেই ধাবিত হয়ে থাকি। আর কুদরত আমাদের খেলাফ হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কাজ হয়েও যায় তবুও এটা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হওয়ার দলিল নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর রাজি হয়ে গিয়েছেন। কারণ, আমাদের কাজ তো হয়ে গিয়েছে। না, দোস্তো! আল্লাহ তা'আলা কখনো নারাজ হয়েও অনেক বেশি কাজ করে দিয়ে থাকেন।

তিনি দুনিয়াতে মানুষের বেশিরভাগ কাজই নারাজ হয়ে আঞ্জাম দেন। রাজি হয়ে খুব কমই আঞ্জাম দেন। কারণ, অধিক অভাব-অনটনে সাহাবাগণই ছিলেন। পক্ষান্তরে আরাম আয়েশে অধিকাংশই ছিল আহলে বাতেল তথা ইহুদী-নাসারারা। কারণ তিনি অমান্যকারীদের কাজই বেশি আঞ্জাম দেন। আর মান্যকারীদের কাজ আঞ্জাম দেন খুব কম। কারণ, তিনি তো মান্যকারীদের সকল ধরনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য জান্নাতের ওয়াদা করে রেখেছেন।

কাজ আঞ্জাম দিবেন কাদের? দুনিয়াতে কাজ আঞ্জাম দিবেন তাদের, যাদের জন্য আখেরাতে নেয়ামতের কোনো হিস্‌সা নেই। আর দুনিয়াতে ঐসকল ঈমানওয়ালারা পেরেশান হবে যাদের ঈমান খুব কমজোর ও দুর্বল। নতুবা ঈমান ও নেক আমলের উপর এ ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বানাবেন। দুর্বল ঈমান ওয়ালারাই বলবে, আল্লাহ তা'আলা যা ইহুদী-নাসারাদেরকে দিয়েছেন তা আমাদেরকে কেন দেননি। যেমন বলেছিলো বনী ইসরাঈলরা,

কারূনের কাছে যা কিছু আল্লাহ আমাদেরও তাই হওয়া চাই।

পক্ষান্তরে একীনওয়ালারা কী বলবেন?

একীনওয়ালারা তো বলবেন,

আরে তোমাদের নাশ হোক। তোমরা এটা কী বলছো? আরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আখেরাতে যা কিছু পাওয়া যাবে তা পুরা দুনিয়া হতেও উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা সওয়াব কোথায় দিবেন?

আখেরাতে দিবেন। সওয়াব তো জান্নাতকেই বলা হয়।

দুর্বল ঈমানওয়ালারা তো দুনিয়াতেই সব কিছু চেয়ে বসবে। কারণ, প্রত্যেক যুগের কারূনও ভিন্ন। প্রত্যেক যুগেই সম্পদ প্রত্যাশী বিদ্যমান থাকবে। আজও রয়েছে ঐ প্রকৃতির লোক। অনেক ঈমানওয়ালারাও এমন। মেরে দোস্তো! বরং সকল ঈমানওয়ালাই এ যুগে সম্পদ প্রত্যাশী। ইহুদী-নাসারাদেরকে দেখে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। তাদের মতই অর্থ-সম্পদ তালাশ করে বেড়াচ্ছে। যখন তাদের উপর ধ্বংস ও সর্বনাশা নেমে আসবে তখন তওবা করতে থাকবে। আর তওবা করবে তারাই যাঁদের মধ্যে ঈমান রয়েছে। আর যাঁদের মধ্যে ঈমান নেই তারা বলবে, এমনটি এ কারণে হয়েছে। এমন না হলে এমন হতো না ইত্যাদি। এরপরও বুঝবে না যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার আযাব।

তাই মেরে দোস্তো! আল্লাহ তা'আলা তো আসবাব বানিয়েছেন ঠিক কিন্তু আসবাবকে স্বীয় কুদরতের মাঝে সুপ্ত রেখেছেন। আসবাব হলো শুধুমাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য। তিনি দেখবেন, মানুষ কোনো একীনের সাথে এ আসবাবগুলো ব্যবহার করে। এভাবে তিনি নবীদেরও ঈমানের পরীক্ষা নিয়েছেন।

আমি হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের কথা আরম্ভ করছিলাম। তিনি রায়হান গাছের দিকে ছুটলেন। রায়হান ব্যবহার করলেন। পেট ব্যথা ভাল হয়ে গেল। এর কিছু দিন পর স্বীয় কুদরতে আবারো পেটে ব্যথা দিলেন। দ্বিতীয়বার পেট ব্যথা অনুভব করার পর তিনি এবারও রায়হান গাছের দিকে ছুটলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে এ ঔষধের কথা কে বলেছিলেন?

স্বয়ং আলেমুল গায়েব আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই গাছন্তের খবর দিয়েছিলেন। কোনো হাকীম বা ডাক্তার খবর দেননি। তাই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম দ্বিতীয়বারও ছুটলেন রায়হান গাছন্তের দিকে। তিনি তা ব্যবহার করলেন। কিন্তু পেট ব্যথা ভাল হলো না। এবার ভালো হলো না কেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, প্রথমবার তুমি আরোগ্য লাভের জন্য আমার দিকে ছুটেছিলে, এরপর আমার হুকুমের ভিত্তিতে তুমি রায়হানের দিকে ছুটেছিলে। আর এবার তুমি আমার হুকুম ছাড়া সরাসরি রায়হানের দিকে ছুটেছো।

মেরে দোস্তো! স্মরণ রাখতে হবে, আসবাব মানুষকে আল্লাহ তা'আলার গায়রের দিকে নিয়ে যাবে। আর নিয়ে যাচ্ছেও। আর আ'মাল নিবে হুকুমের দিকে। আর হুকুম আল্লাহ তা'আলার জাতের দিকে নিয়ে যাবে। এটা হলো আহকামাতের খাসিয়ত বা বৈশিষ্ট্য। তাই প্রথমে নামাজ পড় ও পরে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাও।

আর আসবাব কোথায় নিয়ে যাবে?

আসবাব নিয়ে যাবে অভিজ্ঞতার দিকে। অভিজ্ঞতার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার গায়েরের বিষয়ে আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো আমাদেরকে আসবাব দিয়ে রেখেছেন।

না মেরে দোস্তো! বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসবাব দিয়েছেন নিরেট পরীক্ষার জন্য। আর তিনি আহকামাত দিয়েছেন চিত্তপ্রশান্তির জন্য। হ্যাঁ! চিত্ত-প্রশান্তির জন্যই হলো আল্লাহ তা'আলার আহকামাত।

যিকির কাকে বলে?

যিকির বলা হয় আল্লাহ তা'আলার আহকামকে। প্রত্যেক আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার যাকের বা যিকিরকারী।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আহকামাত কেন দিয়েছেন?

দিয়েছেন এতমিনান করার জন্য। চিত্ত-প্রশান্তির জন্য। আর আসবাব? আসবাব তো হলো পরীক্ষার জন্য। আসবাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান, কে আসবাবের একীনের আহকামাতকে পুরা করে। আর কে আহকামাত পুরা করার মধ্যেই কামিয়াবীর একীন করে আসবাব ব্যবহার করে তাই আল্লাহ তা'আলা পুরো দুনিয়াকে আসবাব দ্বারা ভরে দিয়েছেন। পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি আসবাবকে এনেই থাকেন পরীক্ষা করার জন্য।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পরীক্ষা ছিল অনেক বড় পরীক্ষা। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের পর তাঁর প্রয়োজন ছিল। একজন সাহায্যকারী। কারণ তখন তাঁকে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল অগ্নিকুণ্ডে। তখন সবচেয়ে বড় সবব তথা উপকরণ হিসেবে আগমন করলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি অপেক্ষা বড় আর কোনো মাখলুক নেই। কিন্তু ছোট থেকে ছোট হওয়ার জন্য মাখলূক শব্দটিই যথেষ্ট। প্রত্যেক বস্তুর

খালেক ও মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ ছাড়া বাকি সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার মাখলুক। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অপেক্ষা বড় কোনো মাখলূক আর কাউকে বানাননি। কিন্তু হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কেন মাখলূক?

মেরে দোস্তো! কারো উচ্চতা, দৈর্ঘ্যতা এবং সুঠামদেহী হওয়ার দ্বারা কোনো কিছু হয় না। আর না কিছু হওয়ার। যেহেতু তিনিও আল্লাহ তা'আলার গায়ের এ কারণেই তিনিও মাখলুক। মাখলূক কখনো খালেক হতে পারে না। যে খালেক সে কখনো মাখলূক হতে ছোট হতে পারে না। পক্ষান্তরে যে মাখলূক হবে সে খালেকের অধীনে থেকে কাজ করবে। সে খালেকের ছোট হবে।

সর্বাপেক্ষা বড় মাখলূক হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এমন হয়ে যান যেমন তিনি ছোট একটি পাখি। একেবারেই ক্ষুদ্র পাখির আকার ধারণ করে। যে পাখি অপেক্ষা ছোট আর কোনো পাখি হতে পারে না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের প্রকৃত রূপ তো হতো তার মাথা আল্লাহ তা'আলার আরশ ছুঁয়ে আছে। আর তার পা'গুলো যমিনে রাখা। তার ডানাগুলো পৃথিবির প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ঢেকে রেখেছে। এত বড় মাখলূক হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সামনে এসে উপস্থিত। বলছেন, হে ইবরাহীম! বলুন দেখি, আপনি কী চান?

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! যার এক্বীন বনে যায় সে আল্লাহ ও নিজের মধ্যখানে কোনো মাধ্যম রাখে না। তার নযর সরাসরি আল্লাহ তাআলার জাতের দিকে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর সাহায্য সরাসরি হয়ে থাকে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিজের মধ্যখানে আর কোনো মাধ্যম রাখেননি, কোনো সববকে মাধ্যম বানাননি, তখন আল্লাহ তা'আলাও আগুন নিভানোর জন্য না পানিকে মাধ্যম বানিয়েছেন, না বাতাসকে, না কোন ফেরেশ্তাকে, না কোনো কেমিক্যালকে ব্যবহার করেছেন বরং সরাসরি আগুনকে হুকুম করেছেন। নিজ হুকুমকে ব্যবহার করেছেন।

অতএব, যে আল্লাহ তা'আলা থেকে সরাসরি নিতে শিখবে সে সকল ধরনের আসবাব হতে হাত ধুয়ে ফেলে থাকে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! আমাদের এক্বীন বনেনি। তাই আমাদের এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যখানে নানা ধরনের আসবাব চলে আসে। আসবাব আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যখানে নানা ধরনের আসবাব চলে আসে। আসবাব আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। আসবাব আমাদের আমলের উপর জয়ী হয়ে গিয়েছে।

আসবাবের এ বেড়াজাল হতে এবং আসবাবের এই গলত এক্বীন হতে বের হওয়ার জন্য দাওয়াত ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাল ও আসবাবের মাঝে সব সময়ই মোকাবেলা হতে থাকবে। মেরে দোস্তো! আসবাব ও আমালের এ মোকাবেলাক্ষণে এক্বীনওয়ালারাই জয়ী হয়ে যাবে। আর এক্বীন বনবে দাওয়াতের মাধ্যমে।

দাওয়াত ছাড়া এক্বীন বনবার আর কোনো পথ ও পন্থা নেই। কারণ, দাওয়াতের তাকাযাই হলো যাহেরের খেলাফ বলা। কালিমার দাওয়াতই হলো যাহেরের খেলাফ।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

এর দাওয়াত যাহেরের খেলাফ। যতই তা বলা হবে ততই যাহেরের খেলাফ বলা হবে। আর যতই যাহেরের খেলাফ বলা হবে ততই এক্বীন বনতে থাকবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, আমরা তো যাহেরের অনুকূল বলে যাচ্ছি।

এই যে অসুস্থতা — এই যে ঔষধ
এই যে ভয়-ভীতি — আর এই যে হাতিয়ার
এই পেরেশানী — এই তো আপদ ইত্যাদি

অর্থাৎ আসবাব তো তাৎক্ষণিকভাবে যেহেনে চলে আসে। আমরা সমস্যার শিকার হলে আমাদের যেহেন কি তাৎক্ষণিকভাবে এদিকে যায় যে, সদকা দেয়ার মাধ্যমে সমস্যা দূরীভূত হয় বিপদ আপদ উঠে যায়। এ বিষয়ে সদকা অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও উপকারী আর কিছু নেই।

এক সাহাবী ছিলেন। তিনি আপন জায়নামায থেকে শুরু করে বাহির পর্যন্ত একটি লম্বা রশি বেঁধে রেখেছিলেন। সাহাবী ছিলেন অন্ধ। তাই দরজা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তার একজন রাহবারের প্রয়োজন ছিলো। ঐ রশি তার রাহবারের কাজ করতো। তার মুসল্লাতে টাকা-পয়সা ও খাদ্য-দ্রব্য রাখা

থাকতো। তিনি তথা হতে টাকা-পয়সা নিয়ে রশির সাহায্যে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফকীর-মিসকীন ও গরীব-দুঃখীদেরকে দিয়ে দিতেন। তার ছেলেরা ছিল যুবক। তারা পিতাকে বলতো, আপনি এত কষ্ট করেন কেন? আমাদেরকে বললে আমরাই তো দিতে পারি। আমরাতো ঘরেই থাকি। এখন থেকে আমাদেরকেই বলবেন। আমরাই তা গরীবের হাতে উঠিয়ে দিব।

ঐ সাহাবী ছেলেদেরকে বললেন, বৎস! তোমরা জানো না যে, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, গরীব-মিসকীনদেরকে নিজ হাতে সদকা করা আকস্মিক চলে আসা বিপদ-আপদ এবং দুর্ঘটনাকে প্রতিহত করে।

এখন আমরা কী করে থাকি? আমরা তো বীমা করে থাকি। এটা সরকার থেকে হওয়ার একীন এমনভাবে জন্মাচ্ছে যে, লোকেরা এখন প্রতিযোগিতা দিয়ে বীমা করাচ্ছে। মানুষ তাদের জীবনের বীমা করাচ্ছে। সুতরাং আমরা ধীরে ধীরে সরকারের যিম্মায় চলে যাচ্ছি। কেউ মারা গেলে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা তো পাবে না কিছুই বরং কোট-কাচারিতে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে এবং লাঞ্ছিত হতে হতে জীবন পাড় হয়ে যায়।

অথচ যে ব্যক্তি কোনো গরীব-মিসকীনকে নিজ হাতে দান-খয়রাত করবে সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তায় থাকবে। হায়! আজ এ একীন কারো নেই।

মেরে দোস্তো! আমরা তো আল্লাহ এবং আমাদের মধ্যখানে আসবাবকে মাধ্যম বানিয়ে রেখেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দোকান দিয়ে রেখেছেন। আমাদেরকে জমিদারি দিয়ে রেখেছেন।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো!

পদের সাথে আসবে লাঞ্ছনা।

দোকানদারীর সাথে আসবে ধার করয।

আর জমিদারির মাঝে আসবে বন্যা ইত্যাদি।

কারণ, আসবাব দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। তার সাথে কুদরত দেননি। এ আসবাব নাকামী এবং বিফলতা নিয়ে আসে।

আল্লাহ তা'আলা আসবাব দিয়ে থাকেন। প্রত্যক্ষকারীরা বলে থাকে, দেখো! ঐ যে মেঘ আসছে। আমার জমির উপরই বর্ষিত হবে। কিন্তু তাদের এ খবরও নেই যে, তার মধ্যে ভয়াবহ আযাব সুপ্ত আছে। কার জানা আছে যে, তা হতে পাথর বর্ষিত হবে না পানি। না এত বেশি পানি বর্ষিত হবে যা পৃথিবীকে প্লাবিত করে দিবে। মানুষের নিকট এর কোনো খবর নেই। তারা তো শুধু দেখছে, আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সবব তো পাওয়া গেছে, কিন্তু কুদরত তো এর খেলাফ।

ঐ যে গ্রামীণ আহমক লোক মনে করে বসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে আসবাব দিয়েছেন সে জয়ী হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা এক মিনিটের মধ্যেই আরাম-আয়েশের সমূহ সরঞ্জামাদিকে ধ্বংসাত্মক বানিয়ে দিতে পারেন। হ্যাঁ! এক মিনিটের মধ্যেই। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অস্থির হয়ে যায় যে, এখনই তো এমন ছিল আর এখনই এমন? এমন কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেরে দোস্তো! আল্লাহ তা'আলার গায়েবী নেযাম তো একীন ওয়ালাদের সাথে থাকবে। আমলওয়ালাদের অনুকূল থাকবে। একীন ওয়ালাদের সাথে থাকবে কুদরত। আসবাবওয়ালারা তা দেখে হয়রান ও পেরেশান হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আসবাবওয়ালাদের সামনে নিজের পরিচয় খোলার জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেখান।

নিজ পরিচয় দানকল্পে আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকেও তাঁদের আসবাবের মধ্যে নাকাম ও ব্যর্থ করে দেখিয়েছেন। অথচ তিনি একজন নবী।

লক্ষ্য করুন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আগুন জ্বালানোর জন্য আগুন আনতে গেলেন। একা একা চললেন। স্ত্রী গর্ভবতী। রাত হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। এক্ষুনি হয়তো সন্তান প্রসব করবেন। ওদিকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হলো, বারুদ থেকেই আগুন জ্বলে উঠে। আগুনের প্রয়োজন দেখা দিলে পাথরে পাথরে ঘষা দিলেই আগুন জ্বলে উঠে। এমনটি করার দ্বারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসে। আগুন জ্বলে যায়। কিন্তু যে দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে নিজের পরিচয় করাতে চাইলেন, সে দিন সেখান থেকে আগুন জ্বললো না।

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা কার? হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের। এক জন নবীর অভিজ্ঞতা আজ ফেল। তিনি আগুন জ্বালানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। মানুষ যখন আপন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যায় তখন সে অবশ্যই আসমান পানে তাকায়। এটাই হলো প্রত্যেকের মেযাজ ও রুচি-অভিরুচি। যখন কোনো কাজ হয় না তখন সে আসমানের দিকেই তাকায়।

তাই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামও আসমানের দিকে তাকালেন। সামনে আগুন দেখতে পেলেন। ফলে তিনি খুশি হয়ে গেলেন, ওয়াহ ওয়াহ! আগুন পেয়ে গেছি। আজ যদিও বারুদ হতে আগুন জ্বলেনি কিন্তু জ্বলন্ত আগুনই হাতে চলে এসেছে। তাই তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন। যতই আগুনের কাছে যেতে থাকলেন ততই আগুন পিছিয়ে যেতে থাকলো। ভাবলেন, এটা তো দেখছি অদ্ভূত আগুন। কাছে গেলেই আগুন পিছে চলে যায়। আর পিছিয়ে গেলে তা নিকটে আসে। অদ্ভুত কাণ্ড আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্য এমনটি করছেন। সুতরাং সেখান হতেই তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবী বানিয়ে পাঠালেন। নিজ পরিচয়ে তাকে পরিচিত করলেন।

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى

আমি একমাত্র আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই। সুতরাং আমারই এবাদত করো।

কিন্তু আজ উম্মত নিজ চক্ষুদ্বয়ে আসবাবের পট্টি বেঁধে নিয়েছে। তাই আজ মেহনত করনেওয়ালা সাথীরাও আপন অভিজ্ঞতার আলোকে চলছে। সত্য কথা হলো আজ কাজ করনেওয়ালাদের মধ্যেও এখনো

ঈমান শিখার

যাহেরের খেলাফ বলার

যাহেরের খেলাফ ভাববার

যাহেরের খেলাপ চলবার নিয়্যত আসেনি।

ব্যাস! আসবাব, আসবাব আর আসবাবেরই স্লোগান। আমরা আজ মার্কেটে জুড়ছি। আমরা একত্রিত হচ্ছি পুঁজিবাদীদের ডাকে। আমরা এখনো ঈমানের হাল্কাতে একত্রিত হওয়া শুরু করিনি।

তাই মেরে দোস্তো! ঈমানের শুধু দাবিই নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমানের দাওয়াতই অধিক পছন্দনীয়। কিন্তু মুসলমান আজ এত বড় ধোকায় পড়ে আছে যে, তারা মনে করে, ঈমানের দাওয়াত অমুসলিমদের জন্য। না ভাই! ঈমানের দাওয়াত তো খোদ ঈমানওয়ালাদের জন্য।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟

হে ঈমানওয়ালাগণ! ঈমান আনো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঈমানের মজলিস কায়েম করতেন ঈমানওয়ালাদেরকে নিয়ে। মুশরিকদের নিয়ে নয়।

اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً

এসো, বসো, কিছুক্ষণ ঈমান নিয়ে আসি।

এই ঈমানের মজলিসে গায়েবী নেযামের আলোচনা হতো। কিন্তু আজ এই ঈমানের মজলিস কোথাও হয় না। তিন/চার জনের মজলিসও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আসবাবের আলোচনা করার মত মজলিস তো হাজারো পাওয়া যায়। যেখানে আলোচনা হয় জাহাজের, রকেটের, পরমাণবিক বোমার, ব্যবসা-বাণিজ্যের ও রাজ-রাজত্বের। অর্থাৎ আজ পুরো দুনিয়ার প্রত্যেক ঈমানওয়ালাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈমান নষ্ট হওয়ার মেহনতে লিপ্ত আছে।

ঈমান বনবে কিভাবে?

ঈমান আসবাবের আলোচনা দ্বারা কখনো বনবে না। ঈমান তো বনবে ঐ গায়েবী নেয়ামের আলোচনার মাধ্যমে যা সকল ধরনের যাহেরী নেযামকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়। আজ মসজিদ থেকে বাজার পর্যন্ত এবং ঘর-বাড়ি পর্যন্ত কোথাও ঈমানী হাল্‌কা নেই।

আমার তো খুব আশ্চর্য লাগে যে, মুলকের সকল পুরাতন সাথীরা আমাদের মুলকের মশওয়ারায় শরীক হয়েছিল। আমি নিযামুদ্দীনে তাদেরকে বললাম, আপনারা মসজিদওয়ারী জামা'আতের সাথী। অথচ আপনাদের খবরই নেই যে, মসজিদওয়ারী জামা'আত কোন মাল-মেটেরিয়ালের নাম। কোন মসজিদওয়ারী জামা'আতেই আজ পর্যন্ত ঈমানী হাল্‌কা কায়েম হয়নি।

জান্নাতের

জাহান্নামের

কবরের

ফেরেশ্তাদের

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের

রুবূবিয়্যতের

গায়েবীখাযানার।

আল্লাহ তায়ালার করার কি কি নিয়ম-নীতি রয়েছে?

কোথাও তো মসজিদওয়ারী জামাতের দশজন সাথী, কোথাও তো বিশজন, কোথাও তো ত্রিশজন, কোথাও তো পঞ্চাশজন। মহারাষ্ট্রের লোকেরা তো বললেন, আমাদের কোনো কোনো মসজিদের মসজিদওয়ারী সাথী হলো একশ জন। কিন্তু এমন কোনো মসজিদ তো এখনো হলো না যে, মসজিদওয়ারী সাথীরা বিশ্বের সকল মুসলিম জাতিকে তাদের কারখানা হতে, দোকান-পাট হতে, ক্ষেত-খামার হতে ও ঘর-বাড়ি হতে বের করে মসজিদে নিয়ে এসে ঈমানী হাল্কায় জুড়ে দিবে। সেখানে তারা ঈমানের কথা শ্রবণ করবে। আজ পর্যন্ত কোনো মসজিদেই এমন একটি অবস্থা হয়নি।

তখন আমি ঐ পুরাতন সাথীদেরকে বললাম, এরা তো ঘরওয়ারী জামা'আত, কারখানাওয়ারী জামা'আত, দোকানওয়ারী জামা'আত।

থাকলো মসজিদওয়ারী জামা'আত, মসজিদে তো ঈমানী হাল্কাই নেই, তাহলে এটা আবার কেমন মসজিদওয়ারী জামা'আত। এটা তো দোকানওয়ারী জামা'আত হযে গেল। মসজিদওয়ারী জামা'আত তো হবে তখন, যখন কারখানা হতে, দোকান-পাট হতে, ক্ষেত-খামার হতে ও ঘর-বাড়ি হতে বের করে মসজিদে নিয়ে এসে ঈমানী হাল্কায় জুড়ে দিবে ও সেখানে তারা ঈমানের কথা শ্রবণ করবে, তখনই তো হবে মসজিদওয়ারী জামা'আত।

আমার তো অবাক লাগে যে, মসজিদওয়ারী জামা'আতের সাথীরা আসবাবের মাহাওল (পরিবেশ) থেকে বের হয়ে ঈমানী হাল্কায় বসার স্থলে তারা নিজেরাই আসবাবের মাহাওলে গিয়ে সময় কাটাতে থাকে। এক সাথী এক ঘন্টা কোনো সাথীর দোকানে বসে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এখানে কেন বসে আছেন? সে উত্তরে বলল, আমি এখানে

ঈমানী কাথা বলছি। জিজ্ঞেস করা হলো, এখানে আসবাবের অন্ধকারে তোমার ঈমানী কথাকে কী প্রতিক্রিয়া হবে?

অথবা তোমার ঈমান কি এমন যে, তোমার অন্তর এখানে আসবাবের অন্ধকার দ্বারা প্রতিক্রিয়া হবে না?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।তিনি লোকদেরকে জমা করতেন ও বলতেন, এসো, বসো, কিছুক্ষণ ঈমান আনি। এমন বলেননি যে, এসে আমরা তো ঈমান এনেই ফেলেছি এখন আমল করি। মেরে দোস্তো! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাদেরকে ঈমানের দাওয়াতের উপর উঠিয়েছিলেন। কালিমার দাওয়াতের উপর উঠিয়েছিলেন। এমন নয় যে, কালিমা পড়ে নিয়েছো, এখন তোমার দায়িত্বে এই এই আমল। যাও এই আমল করতো থাকবে। প্রত্যেকে এ কথা জানতো যে, আমার ঈমানের উন্নতি সাধনের জন্য আমাকে কালিমা দেয়া হয়েছে। কালিমার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাই তাদের প্রত্যেকেই কালিমার দায়ী ছিলেন।

নিজ ঈমানের উন্নতি সাধনের জন্য,

কোন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হযে না যায় এ লক্ষ্যে,

ইসলমে ঢুকবার পথ উম্মুক্ত করার জন্য,

যাতে বিশ্বের সকল লোক ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে এজন্য।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! কালিমার দাওয়াত সর্বপ্রথম তো ঈমান ওয়ালাদের থেকেই বিদায় নিবে। এরপর ঈমানওয়ালারা ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাবে। এটাই বাস্তব। আমি সত্যই বাস্তব কথা বলছি।

লক্ষ্য করুন! আমার কথা গভীরভাবে শুনুন। এই উম্মতের এরতেদাদের (মুরতাদ হওয়ার) একমাত্র কারণ হলো তারা পরস্পর ঈমানী দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমি কসম খেয়ে বলবো, কালিমাওয়ালারা যখন কালিমার দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে তখনই মুসলমান ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাচ্ছে। উম্মত যখনই দাওয়াত ছেড়ে দিবে তখনই উম্মতের মধ্যে রিদ্দাত তথা ধর্মচ্যুতি চলে আসবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, যখন ঈমানওয়ালারা ঈমানের মেহনত ছেড়ে দিবে, কালিমার দাওয়াত ছেড়ে দিবে তখন যারা ইসলাম থেকে পালাবার তারা পালিয়ে যাবে। ইসলামে

প্রবেশের পথ সংকীর্ণ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র কালিমার দাওয়াত ছুটে যাওয়ার কারণে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! এটা আমার কোনো কাল্পনিক কথা নয় বরং বাস্তব কথা। কোনো অতিরঞ্জনও নয়। এটা দৃঢ় কথা যে, মদীনা মুনাওয়ারায় সকল আমলই চলছিল উন্নতমানের। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর দাওয়াতের মধ্যে অভাব দেখা দিল। ফলে তৎক্ষণাৎ এরতেদাদ (ধর্মান্তরিত হওয়া) দেখা দিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তৎক্ষণাৎ মদীনা খালি করার কথা ভেবে নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, সকলে মদীনা থেকে চলে যাও। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন রিদ্দতের চিকিৎসক। অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাওয়াতের মেহনত করেছেন ফলে রিদ্দত (ধর্মান্তর প্রবণতা) খতম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং একথা শতভাগ নিশ্চিত যে, উম্মত হতে যখন কালিমার দাওয়াত বিদায় নিবে তখন তাদের মধ্যে এরতেদাদ (ধর্মচ্যুত হওয়ার প্রবণতা) চলে আসবে।

বিশাল একটি বসতির ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাওয়া বড় কথা নয়। একজন সাধারণ লোকের ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়া অনেক বড় কথা। অনেক বড় ক্ষতির বিষয়। একজন মূর্খ লোক, যে কিছুই জানে না, কিছুই পারে না, তারও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এত বড় ক্ষতির বিষয় যার ক্ষতিপূরণ বিশাল এক গ্রামের লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দ্বারাও হবে না।

হযরত ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, উম্মত যখন কালিমার দাওয়াত ছেড়ে দিবে তখন উম্মতের নিকট অন্য দ্বীন-ধর্ম ভাল মনে হতে থাকবে।

তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গো! আমরা সর্ব প্রথম ঈমানের হাল্‌কা কায়েম করি। যত সাথীই মসজিদে জুড়ছে সকলকে নিয়েই ঈমানী হাল্‌কা কায়েম করুন। আগন্তুক লোকদেরকে মসজিদের পরিবেশে ঈমানের দাওয়াত দিন। জেনে রাখুন! আমি সত্য ও বাস্তব কথা বলছি যে, আমলের দাওয়াতের মাধ্যমেও রিদ্দত খতম হবে না। রিদ্দত তো একমাত্র খতম হবে না। রিদ্দত

তো একমাত্র খতম হবে যখন কালিমার দাওয়াত হবে। ঈমানের দাওয়াত হবে। আমলের দাওয়াত দ্বারা রিদ্দত খতম হবে না।

যিনি প্রথম দিনের দা'য়ী ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, তিনি প্রথম দিন থেকেই ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কালিমাকে পেশ করেছেন তখন তিন শ্রেণীর লোকের সামনে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। আর দুনিয়ার সকল মানব জাতি এ তিন শ্রেণীর মাঝেই বিভক্ত। তারা হলো, নারী-পুরুষ ও শিশু বাচ্চা। তিনি একই সময়ে এ তিন শ্রেণীর লোকের সামনে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন।

১. হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে

২. হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে

৩. হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে।

তিনি প্রথম দিনেই কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে মুমিন ও পরে কালিমার দা'য়ী বানিয়েছেন। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথম দিন হতেই দ্বীনের দা'য়ী ছিলেন।

আর তাঁর প্রথম দিনের কামাই ছিল ছয় জন। তাদের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন এমন যারা দুনিয়া থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ অর্জন করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন এ উম্মতের প্রথম দা'য়ী। যেহেতু প্রথম দিন থেকেই দায়ী ছিলেন তাই উম্মতের শেষদিন অর্থাৎ যে দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সেদিন থেকেই উম্মতের মধ্যে ইরতেদাদ চলে এসেছে। আর তিনিই সেই ইরতিদাদের মোকাবেলা করেছেন। একাই প্রতিকার করেছেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম এমনকি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই সৎসাহসিকতার সাথে সকল ধরনের বেগতিক অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! দা'য়ীই একমাত্র সিফত যে, তারা মুহূর্তের তরেও দ্বীনের লোকসান তথা ক্ষয়-ক্ষতি বরদাশ্‌ত করবে না। এটাই

পাকাপাকি কথা যে, দ্বীনের ক্ষতি হবে আর আবু বকর জীবিত থাকবে এটা তো কখনো হতে পারে না। কারণ, দা'য়ী তো কখনোই দ্বীনের সামান্য ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে পারবে না।

এখন যদি আমাদের মাথায় এ কথা থাকে যে, আমরা সকলেই দাওয়াতের কাজ করছি। তাই আমরা সকলেই দা'য়ী। এখান থেকেই অনুমান করুন যে, আমাদের ঘরের ভিতর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত দ্বীনের যত ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কী অবস্থা বিরাজ করছে? বাইরের কথা পরে। আগে তো দেখি, আমার নিজের ছেলে দ্বীনের যে ক্ষতি করছে সে জন্য আমার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, তাবলিগী হয়ে যাওয়াই বড় কথা নয় যে, তিন দিন লাগালাম তাবলীগি হয়ে গেলাম। তাবলীগি জামাআতের সদস্য হয়ে গেলাম। চিল্লা লাগালাম, দাওয়াতের কাজ করনেওয়ালা হয়ে গেলাম। কারো উপর জামাতী/তাবলীগি সিল লেগে যাওয়া তো খুব সহজ। জামা'আতের কাজের সাথে নিসবত (সম্পর্কে) হয়ে যাওয়া তো খুব সহজ বিষয়। কিন্তু মূল বিষয় হলো ভেতরগত অবস্থায় পরিবর্তন চলে আসা।

কত চার মাস লাগানেওয়ালা,

প্রতি বছর চার মাস লাগানেওয়ালা

প্রতি বছর চিল্লা দেনেওয়ালা,

মাকামী কাজ করনেওয়ালা,

মাসে মাসে তিন দিন দেনেওয়ালা কত রয়েছে,

কিন্তু প্রশ্ন হলো কয়জন সাথী এমন রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামকে নিজ জীবনের একমাত্র এক্বীনি আসবাব মনে করছেন? বাস্তব কথা হলো, দাওয়াতের কাজ তো কাজ করনেওয়ালাদের মধ্য থেকেই বিদায় নিয়ে নিয়েছে। আমাদের থেকে দাওয়াত ছুটে যাওয়ার কারণে না আমাদের এক্বীন পরিবর্তন হয়েছে না সমাজে পরিবর্তন আসছে। হ্যাঁ! দাওয়াতের দু'টি বৈশিষ্ট। একটি হলো এক্বীনে পরিবর্তন আনা ও অপরটি হলো সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসা। এটাই কালিমার প্রভাব।

এক্বীনও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সমাজও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মানুষ সাপ-বিচ্ছু খাওয়াও ছাড়েনি। সাহাবায়ে কেরাম তো বলতেন, আমাদের অবস্থা তো এমন হয়ে গিয়েছিল, আমাদের মূর্খতা ও বর্বরতা ছিল ভিন্ন আর কুফুরি ছিল ভিন্ন। না ধর্মের দিক দিয়ে, না পার্থিব দিক দিয়ে। আমাদের মধ্যকার কারো মধ্যে কোনোরূপ যোগ্যতা ও দক্ষতাই ছিল না। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাদেরকে কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে এক্বীনও পরিবর্তন হতো এবং সমাজেও পরিবর্তন আসতো। আবার যখন উম্মত হতে কালিমার দাওয়াত বের হয়ে যাবে তখন এক্বীনও নষ্ট হয়ে যাবে এবং সমাজও নষ্ট হয়ে যাবে।

এ কারণেই হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রত্যেক উম্মতকে দাওয়াত জেনেওয়ালা বানিয়েছেন। প্রত্যেকেই এ কথা জানতো যে, আমি উম্মতের হেদায়াতের যরিয়া (মাধ্যম)।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! লক্ষ্য করুন, খুব জরুরি কথা। আমাদেরকে প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একথার এহসাস ও অনুভূতি জন্মাতে হবে যে, আমি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব (প্রতিনিধি) হওয়ার কারণে প্রত্যেক উম্মতের হেদায়াতের যিম্মাদার হয়ে আছি। এ কথা খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, আমি উম্মত হওয়ার কারণে কালিমার দাওয়াতের যিম্মাদার হয়ে আছি।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদেরকে বানানো হয়েছে উম্মতের কল্যাণার্থে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবে। আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে থাকবে।

তোমাদেরকে উম্মতের উপকারার্থে বানানো হয়েছে।

কী সেই উপকারকরণ?

তা হলো, তোমরা মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলা পরিচয় ফুটিয়ে তোল। অর্থাৎ কালিমার দাওয়াত দাও। তোমরা লোকদের অন্তর হতে আসবাবের এক্বীন বের করে থাকো। কিন্তু এর সাথে এ শর্ত সম্পৃক্ত যে,

তোমাদের নিজেদের অন্তরেও আল্লাহ তা'আলার জাত ও রুবুবিয়্যতের একীন ও দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে।

মনে রাখবেন, মেরে দোস্তো! প্রত্যেক উম্মতই পুরো মুসলিম উম্মাহর হেদায়াতের মাধ্যম।

কিন্তু তারা ব্যবসা করেও উম্মতের হেদায়াতের যরিয়া (মাধ্যম)

তারা কৃষিকাজ করেও গোটা উম্মতের হেদায়াতের যরিয়া।

অথবা শুধু ঘরে বসে থেকেই তারা গোটা উম্মতের হেদায়াতের জন্য দু'আ করছে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে সকল সঠিক পথের হেদায়াত দাও।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! হেদায়াত নিরেট হেদায়াতের দু'আ দিয়েই নয়। বরং হেদায়াতের দু'আও কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে কবূল হয়ে থাকে। যখন উম্মতের মধ্যে দাওয়াতের মেহনত থাকবে না তখন উম্মত থেকে হেদায়াতের দু'আ কবূল হওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কালিমার দাওয়াত দু'আ কবুল হওয়ার শর্ত।

দাওয়াত কী?

দাওয়াত হলো, দু'আ কবূল হওয়ার শর্ত। উম্মত যখন দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিবে তখন উম্মত দু'আ করাও ছেড়ে দিবে। এটা একেবারেই পাকাপাকি কথা। কারণ, কালিমার দাওয়াত ও দু'আ দুনোটা একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কালিমার দাওয়াত ছুটে যাওয়ার মাধ্যমে আসবাবের একীন আসে। আর আসবাবের একীনের উম্মতকে দু'আ হতে বঞ্চিত করে দেয়। এটা সাদাসিধে কথা।

দাওয়াত ছুটে যাওয়ার দ্বারা কী আসবে ভাই! কালিমার দাওয়াত ছুটে যাওয়ার দ্বারা আসবাবের একীন আসবে। আর আসবাবের একীন দুআ থেকে বঞ্চিত করে দেয়। এ বিশ্বাস আনয়ন করে যে, দুআ দ্বারা কী হবে? দোকান দ্বারা হবে। রাজত্ব দ্বারা হবে, দু'আ দ্বারা কী হবে?

আমি মাত্রই এক সফরে গেলাম। বরুতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। পথে দেখতে পেলাম মুসলিম অমুসলিম নারী-পুরুষ বাচ্চা-

শিশুদের নিয়ে বিড় করে কোথাও যাচ্ছে। আমি গ্লাস খুলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই! কী হচ্ছে এখানে? এটা কিসের র‍্যালী? কী এসব?

তারা বলতে লাগলো, এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুত নেই। তাই বিদ্যুতের দাবি নিয়ে এই র‍্যালী।

জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তোমরা যাচ্ছো কোথায়?

তারা উত্তরে বলল, আমরা এখানকার থানা ঘেরাও করতে যাচ্ছি।

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা থানায় না গিয়ে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট বিদ্যুৎ মঞ্জুর করিয়ে নাও। যদি আল্লাহ তা'আলা এ সরকার থেকে কাজ নিতে চান তাহলে তাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দিবেন। আর যদি তাদের থেকে কাজ নিতে না চান তাহলে অন্য যে কোনো মাধ্যমে তোমাদের বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবেন।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো আযীযো! যখন একীন নষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ মসজিদকে ঠিকানা বানানোর স্থলে মানুষের নিকট ধরণা দেয়া শুরু করে। যখন ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তখন রোযা রাখার স্থলে ক্ষুধার্ত থেকে অনশন করতে থাকে। এগুলো কী? ক্ষুধার্ত থেকে অনশন করে লাভই বা হবে কী? এর দ্বারা তো দাবিও পুরা হবার নয় এবং পেটের ক্ষুধাও দূর হবার নয়। বরং এটা তো হলো দুনিয়ার একটা আযাব। আবার আখেরাতেও তো আরেক আযাব হবে। যখন একীন নষ্ট হয়ে যাবে তখন কি কি করবে?

ধরণা দিবে

ক্ষুধার্ত থেকে অনশন ধর্মঘট দিবে।

র‍্যালী বের করবে।

হরতাল করবে।

মিছিল করবে।

আরে মসজিদকে ঠিকানা বানাও। সাহাবায়ে কেরাম কী করতেন?

অন্ধকার এসে গেছে তখন কী করতেন?

অতি খড়া হচ্ছে ও অনাবৃষ্টি দেখা দিচ্ছে তখন কি করতেন?

মামলা-মোকদ্দমার শিকার হয়েছেন তখন কী করতেন?

ঋণগ্রস্থ হয়ে গিয়েছেন তখন কী করতেন? মসজিদে চলে যেতেন। কোথায় যাবে এ সরকার ও তাদের স্কীমসমূহ। আজ সরকার ও তাদের স্কীমের উপর বিশ্বাস ও একীন থাকার কারণেই তাদের হারাম দ্রব্য

মুসলমান খাবে। এরপর তার ওলামাগণকে বলবে এটাকে এইভাবে করে দিন (অর্থাৎ হালাল করে দিন।) এটাতো হালাল, হারাম তো ঐটা। ইত্যাদি। অথচ, এটা হারামেরই পরিবর্তিত সুরত।

হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, তোমরা শূকরেরই গোস্ত খাচ্ছো। চাই শূকরের গোশ্ত খাও বা শুকরের চর্বি মিশ্রিত বিস্কিট খাওনা কেন। দুনোটাই তো হারাম। বাতেল হারামের শেকেল ও সুরত পরিবর্তন করে মুসলমানদেরকে হারাম খাওয়াবে। যাতে তাদের এক্বীন পাল্টে যায়। আর তারা দু'আ কবূল হওয়া থেকে মাহরূম হয়ে যায়। তাহলেই তো বাতিলের চরকা ঠিকমত ঘুরতে থাকবে। মেরে দোস্তো! এ যমানায় মানুষ হালালের তালাশে এত বেশি উঠে পড়ে লাগছে না যত বেশি উঠে পড়ে লাগছে হারামকে হালাল করার পেছনে।

উম্মত যদি হালাল উপার্জনের তালাশে উঠে পড়ে লাগে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে হালাল উপার্জনের রাস্তা খুলে দিবেন। আর সে জন্য আসবাবও সহজ করে দিবেন।

তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গো! উম্মতকে কালিমার দাওয়াতের উপর উঠাতে হবে। যাতে ঈমানের দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার উপর এক্বীন জন্মে। আর বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার এক্বীনের উপর দাঁড় হবে তখন আল্লাহ তা'আলা হুকুম-আহকাম আমাদের জন্য এক্বীনি সবব (নিশ্চত উপকরণে) পরিণত হয়ে যাবে। এতটুকু ঈমান শিক্ষা করা আমাদের উপর ফরয যদ্বারা এ কালিমা আমাদেরকে আসবাবের এক্বীন থেকে বের করে দেয়।

এ জন্যই তো হলো ঈমানের দাওয়াত।

কালিমার দাওয়াত।

কালিমার মেহনত।

এটাইহলো কাজ। কারণ, ঈমান ছাড়া কোন আমল আল্লাহ তা'আলার কুদরতী খাযানা থেকে উপকার দিবেন। মেহনত তো প্রত্যেকেই করে যাচ্ছে। কিন্তু ঈমান কি শুধু ঈমানের দাবি করার দ্বারাই পয়দা হবে? ঈমান কি এমনি এমনিই বৃদ্ধি পেতে থাকবে? না কখনো না বরং ঈমান বনবে ঈমানের দাওয়াত দ্বারা।

ঈমান বাড়বে ঈমানের দাওয়াত দ্বারা। এর ঈমানের দাওয়াতের সাথে ঈমান ও আমলের দাওয়াত চলবে, এরপর আমলের দাওয়াতের সাথে আখেরাতের দাওয়াত, এটাই ছিল সকল নবী রাসূলের কাজ।

إِنِّي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا

আসবাব থেকে ঈমানের দিকে। বস্তু থেকে আমলের দিকে।

দুনিয়া হতে আখেরাতের দিকে। যার প্রথম ঘাঁটি হলো কবর, দ্বিতীয় ঘাঁটি হলো হাশরের ময়দান, এরপর সর্বশেষ ঘাঁটি হলো হয়তো জান্নাত নয়তো জাহান্নাম।

এটাই হলো দাওয়াতের তারতীব। হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, কবরে জবান চলবে এক্বীনের ভিত্তিতে। শুধু এলমের উপর ভিত্তি করে নয়। আমাদের খুব ভাল করেই জানা, কবরে তিনটি প্রশ্ন হবে–

مَنْ رَّبُّكَ، مَا دِيْنُكَ، مَنْ نَّبِيُّكَ

এখানে তোমাদের প্রয়োজন কবরে, হাশরে জান্নাতে ও জাহান্নামে কে পুরা করবে?

প্রয়োজন মিটানোর কি কি আসবাব রয়েছে, আর কি কি পদ্ধতি রয়েছে? আর সেই আসবাব ও পদ্ধতি অর্জন করার জন্য কি মেহনত? তা কোন নবী তোমাদেরকে শিখিয়েছে?

এগুলো জানার দ্বারাই কবরে জবান চলবে না। এর উত্তর শুধু জ্ঞানে করে কবরে নিয়ে গেলেই কাজ চলবে না। এর উত্তরে জ্ঞানী হয়ে গেলেও কবরে ও হাশরে নাকাম হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কবরে নাকাম হয়ে যাবে সে সামনের সকল ঘাঁটিতেও নাকাম ও বিফল হয়ে যাবে। কারণ, সেখানকার বিষয় তো এক্বীনের।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এক্বীন এমন হয়ে গিয়েছিল যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সম্মুখে কবর জগতের পুরা নকশা তুলে ধরেছেন। হে ওমর! দেখ! তোমাকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মুনকার-নকীর তোমার নিকট এই এই সওয়াল করবে।

তাদের আওয়াজ হবে বজ্রের মত।

তাদের চুলগুলো তাদের পায়ে পেঁচানো থাকবে।

তারা আপন দাঁত দিয়ে তোমার কবর খনন করবে।

তাদের হাতে এত ভয়ংকর হাতুড়ি থাকবে যে, সারা মিনাবাসীরা মিলেও তা নাড়াতে পারবে না। হে ওমর! তারা তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করবে।

ঐ আসবাব কী যদ্দারা তোমার প্রয়োজন মিটবে?

ঐ ব্যক্তি কে যে তোমাকে এর তরীকা বাতলে দিয়েছেন?

ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তুমি যদি সামান্যও আটকে যাও তাহলে তারা ঐ হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করবে যে, তোমার অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সব কথা শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন কি আমার অবস্থা এমনই হবে যেমন এখন আছি?

উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! তখন তোমার অবস্থা এমনই হবে।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আচ্ছা! তাহলে তো আমি তা সামাল দিতে পারবো।

ঈমান মানুষকে নিরাপত্তা দান করবে।

ঈমান মানুষকে নিরাপত্তাও দান করে এবং ভয়-ভীতিও আনয়ন করে। অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে ভয়-ভীতিও রয়েছে এবং আশাও রয়েছে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি এ ঘোষণা হয়ে যায় যে, সকল মানুষই জান্নাতে যাবে শুধু একজন যাবে জাহান্নামে তাহলে আমার এ ভয় হয় যে, হয়তো ঐ জাহান্নামগামী লোকটি আমিই হবো। আর যদি এ ঘোষণা হয়ে যায় যে, সকল লোক জাহান্নামে যাবে তবে শুধু একজন জান্নাতে যাবে তাহলে আমার এতটুকু আশা হয় যে, ঐ জান্নাতগামী লোকটি আমিই হবো। লক্ষ করুন এমন ভয় আবার এমন আশা এরপরও অন্তর এত এতমিনান (প্রশান্ত) যে, তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, তাহলে তো আমি মুনকার নকীরকে শামলাতে পারবো।

এরপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আগমগন করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরয করলেন, এই যে আপনার সাথী ওমর, তার ঈমান এমন যে, কবরে তাকে সওয়াল করা হলে সে তো প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক মত দিবেই উপরন্তু তিনি উল্টা ফেরেশ্তাদেরকে প্রশ্ন করা শুরু করবেন।

مَنْ رَّبُّكَ، مَا دِيْنُكَ، مَنْ نَّبِيُّكَ

এরপর ফেরেশতারা বলতে থাকবে জানি না আজ আমাদেরকে উমরের নিকট পাঠানো হলো কেন? আমরা তার পরীক্ষা নিব এ জন্য না সে আমাদের পরীক্ষা নিবে? আমাদেরকে কেন পাঠানো হলো তার কাছে?

কিন্তু আজ তো কালিমার দাওয়াত উম্মত থেকে একেবারেই বিদায় নিয়ে গিয়েছে। আজ উম্মত ঈমানের সাথে না জুড়ে আসবাবের সাথে জুড়ছে। গোটা পৃথিবীর সকল লোকই আজ আসবাবের উপর জমা হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তিতে

অস্ত্র-শস্ত্রের ভিত্তিতে

ক্ষেত-খামারের ভিত্তিতে।

এরা সকলেই সামনে অগ্রসর হয়ে নাকামী ও বিফলতা দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানের ভিত্তিতে জমা হবে, আহকামাতের ভিত্তিতে জমা হবে, ঈমানের হাল্কায় জমা হবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যাহেরের খেলাফ করে দেখাবেন।

আল্লাহ তা'আলা পূর্বকালেও করে দেখিয়েছেন। ভবিষ্যতেও করে দেখাবেন। এখনও করে দেখাচ্ছেন।

ভাই, মেরে দোস্তো! যখন বাতেল নকশাসমূহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়, এরপরও ঈমানওয়ালাদের হুঁশ না আসে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও মেরে কবরে দাখিল করে আযাব দেয়া শুরু করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা তো বাতিল নকশাকে ঈমানওয়ালাদের জন্যই ভেঙ্গে দেন যে, দেখো! এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। আর যদি তোমরা তা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ না কর তাহলে আমি তোমাদের নকশাকেও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব। এমনভাবে যেমন আমি বাতেলের নকশা ভেঙ্গে দিয়ে থাকি। আল্লাহ তা'আলাই সমস্যা নিয়ে আসেন। তা দ্বারা ঈমানওয়ালারাই বুঝে থাকেন।

বে-ঈমান লোকেরা তো বুঝে না যে, তার ব্যবসা কেন চলছে না। তাই হুযূরের নিকট এসে বলে, হুযুর! আমার ব্যবসা কেন চলছে না। তাই হুযুরের নিকট এসে বলে, হুযুর! আমার ব্যবসা চলছে না। আমাকে কোনো ওযীফা বাতলে দিন। আরে ভাই! আল্লাহ তা'আলা তো তোমাকে বড় ধরনের ওযীফা দিয়ে রেখেছেন। তুমি তো নামাযের মাধ্যমে নেয়াই শিখোনি। তাহলে তোমার সমস্যা দূর হবে কিভাবে? তোমাকে নামাযের ব্যাপারে বলা হলে তুমি বলে থাকো, দু'আ করতে থাকুন যাতে আল্লাহ তা'আলার নামায পড়ার তাওফীক দিন। কিন্তু এখন তো কোনো তাবীজ দিয়ে দিন নয়তো কোনো ওযীফা বাতলে দিন যাতে আমার ঋণগুলো পরিশোধ হয়ে যায়।

যার একীন আল্লাহ তা'আলার জাতের উপর হয় না তার আমল তাকে কোনো কাজ দেয় না। সে তো ফরয ছেড়ে নফলের দিকে দৌড়াতে থাকবে। ইসলামে তার কোন হিস্‌সা নেই। সে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা হতে কিভাবে উপকৃত হতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তো ইসলামের সাথে। তার ওয়াদা তো তার হুকুম পুরা করার সাথে। যখন ইসলামে তার কোনো হিস্‌সাই নেই তাহলে তার আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরা হবে কিভাবে? যেমন আজ দুনিয়া ভর শেয়ার বাজার চলছে। তাতে নানান ধরনের অংশদারিত্ব হয়ে থাকে। লোকেরা তাতে অংশিদার হয়ে থাকে। এরপর ঘরে বসে বসে টাকা-পয়সা পাওয়া যায়। এমন ব্যক্তি ইসলামে কোনো হিস্‌সাই নেই। যার মধ্যে কোনো নামাজ নেই ইসলামে তার কোনো হিস্‌সা নেই। তাহলে তার হজ্জ ও যাকাত তাকে কী ফায়দা দিবে? যার মধ্যে নামাযই নেই তার নিকট তো ইসলামের ভিত্তিই নেই।

তাই ভেবে দেখুন ভাই! একীনি আসবাব (নিশ্চিত উপকরণ) কী? আর গায়রে একীনি আসবাব (অনিশ্চিত উপকরণ) কী? আর এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? একীনওয়ালারাই এর মধ্যে পার্থক্য বিধান করতে পারবে। আর যার একীনই নেই সে তো বুঝতেই পারবে না যে, সমস্যা কেন আসছে। আল্লাহ তা'আলা সমস্যা দেন মানুষকে বুঝানোর জন্য। সতর্ক করার জন্য। এসব সমস্যার শিকার হয়েও যদি মানুষ ফিরে না আসে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা কবরে তাকে জনমের শিক্ষা দিবেন।

মেরে দোস্তো! সমস্যা আসে সতর্ক করার জন্য। তাই সমস্যাকে নিজ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখো। হতে পারে যে, এ সমস্যাই তোমার তারবিয়ত করে দিবে। আগেও বাড়িয়ে দিবেন।

ঈমানের আলামত হলো ঈমানওয়ালা সমস্যাকে আসবাবের সাথে মিলাবে না। এটা হলো ঈমানের আলামত। ঈমানওয়ালা তো সমস্যাকে নিজ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখবে। বে-ঈমানরাই নিজ সমস্যাকে আসবাবের সাথে মিলিয়ে দেখে। তাই বে-ঈমানের জীবনে সমস্যা যতই খারাপ আকারে আসবে সে ততই আসবাব বানানোতে লিপ্ত হয়ে যাবে যে,

এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, এখন অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা কর।

এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, এখন অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা কর।

এই রোগ দেখা দিয়েছে, এখন ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা কর।

হ্যাঁ! লোকেরা একথাই মনে করে থাকে, রোগের জন্য ওষুধ রয়েছে। এখনও আমরা আমলের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করাতে পারিনি। আমাদের তো এ খবরও নেই যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছুটে যায় তখন এই হুকুম ছুটার কারণে ঐ অঙ্গে কোন ধরনে রোগ-বালাই নেমে আসে।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে হুকুম ভাঙ্গার কারণে কোনো কোনো রোগ আসে, আমরা কখনো তা জানতেও চাইনি। জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

যেমন এইডস এর মত জঘণ্য রোগ। এটা হলো লজ্জাস্থানের রোগ। এটা লজ্জাস্থানের হুকুম ভাঙ্গার কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ রোগ দিয়েছেন।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যেই অঙ্গ হতে আল্লাহ তা'আলার হুকুম নষ্ট হবে ঐ অঙ্গের রোগের সর্বপ্রথম কারণ হলো ঐ অঙ্গ হতে আল্লাহ তা'আলার হুকুম নষ্ট হওয়া।

তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গো! খুবই বুদ্ধিমত্তার কথা ও খুবই সফলতার পথ হলো এই যে, নিজ সমস্যাকে আসবাবের সাথে না মিলিয়ে নিজ আমলের সাথে মিলানো চাই।

তখন সমস্যাই তরবিয়ত করে দিবে। কারণ, সমস্যাই তরবিয়ত ও উন্নতি নিয়ে আসে। এই যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ, মামলা-মোকাদ্দমা ও ধার-করজ এর সবই হলো তরবিয়তের জন্য। যাতে মানুষ সঠিক পথের পথিক হয়ে যায়। তবে তরবিয়ত ও তারাক্কি (উন্নতি) আনবে ঈমানওয়ালার জীবনে। এটাই হরো ঈমানের আলামত যে,

ঈমানওয়ালা নিজ জীবনের সমস্যাগুলোকে তার আমলের সাথে মিলিয়ে দেখবে। আর বে-ঈমান লোকেরা তাদের সমস্যাগুলোকে তাদের আসবাবের সাথে মিলিয়ে দেখবে।

কারণ, আল্লাহ তা'আলা ঈমানওয়ালাদেরকে তাঁর আহকামাত দিয়ে রেখেছেন। আর বে-ঈমানকে দিয়ে রেখেছেন আসবাব ও পার্থিব সরঞ্জামাদি।

হ্যাঁ! এটা পরিষ্কার কথা, এতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। এ কথা বুঝতে কোনোরূপ কষ্টও হবে না যে, আল্লাহ তা'আলা আসবাব দিয়েছেন বে-ঈমানদেরকে আর ঈমানওয়ালাদেরকে দিয়ে রেখেছেন আহকামাত।

তাই বে-ঈমান তাদের আসবাব দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকে। যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার জাতের প্রতি কোনো এক্বীন নেই তারা পার্থিব ধন-সম্পত্তি দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকে, প্রশান্ত চিত্তে বসে থাকে। কুরআন বলেছে, এটা আমার নিশানার মধ্য হতে যে, তারা আমার আহকামাত হতে গাফেল। পক্ষান্তরে ঈমানওয়ালাদেরকে আমি আসবাবের স্থলে আহকামাত দিয়ে রেখেছি। এটাই পাকাপাকি কথা।

তাহলে কি ঈমানওয়ালারা আসবাব গ্রহণ করবে না? না, বিষয়টি এমন নয়। বরং তারাও আসবাবকে ব্যবহার করবে তবে আহকামের ভিত্তিতে। তারা তো আসবাবের মধ্যে আহকামাত তালাশ করবে।

অমুসলিমদের নিকট কামিয়াবীর সবব হলো ব্যবসা-বাণিজ্য।

আর ঈমানওয়ালাদের নিকট কামিয়াবীর সবব হলো আল্লাহ তা'আলার হুকুম।

মেরে দোস্তো! যখন ঈমান থাকবে না তাহলে আমরাও অমুসলমানদের মত ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকবো। সুদি লেনদেন করতে থাকবো ও বলতে থাকবো দুনিয়াতো দারুল আসবাব। যে কোনো সবব তো বানাতে

ইহবে। সুতরাং তাদের জীবনে আসবাবের এক্বীনের কারণে হারাম আসবাব চলে আসছে।

জীবনে এক্বীন তো আসবে বিশেষ এক পন্থা ও পদ্ধতিতে। ভাষণের মাধ্যমে জীবনে এক্বীন আসে না। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যখন এক্বীনের আলোচনা হয় তখন এক্বীনের মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাও যেন তোমাদের ভেতরকার শিরক তোমাদের নযরে ধরা পড়তে থাকে। এমন যাতে না হয় যে, এক্বীনের আলোচনার মধ্যে অন্য কোনো আলোচনা চলে আসে বা অন্য কোনো কথা মনে আসে।

মেরে দোস্তো, খুব লক্ষ্য করে শুনুন! নিজেকে এক্বীনি আসবাবের মধ্যে নিয়ে আসুন। এক্বীনি আসবাবের মধ্যে তো সে আসবে যে ঈমানের হাল্‌কা কায়েম করবে। সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমানের হাল্‌কাতে বসেই নিজ নিজ ঈমান বানাতেন। আজ তো সেই ঈমানের হাল্‌কা খতমই হয়ে গিয়েছে যে, এসো বসো, কিছুক্ষণ ঈমান আনি। এর প্রথম কারণ হলো, ঈমানের দাওয়াতকে অমুসলিমদের জন্য খাস করে ফেলেছি। এই উম্মতের সবচেয়ে বড় বিপদ এটাই যে, কালিমার দাওয়াতকে অমুসলিমদের জন্য খাস করে বসে আছে। আর আমরাতো ঈমানওয়ালা আছিই।

আমাদের ঈমানের দাবিই আমাদেরকে ঈমান থেকে গাফেল করে দিয়েছে। ভাই! ঈমানের দাবি নয়, বরং ঈমানের দাওয়াত আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। যে ঈমানের দাবি করবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার ঈমানের পরীক্ষা করবেন যে, তুমি কিভাবে একথা বললে যে, তুমি ঈমান নিয়ে এসেছো। অথচ ঈমান তো তোমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেনি। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন।

لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

তোমরা তো ঈমান আনোনি তবে তোমরা বল, ইসলাম গ্রহণ করেছি।

হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এরশাদ ফরমাচ্ছেন, এটা ঈমান নয় ইসলাম। ঈমান তো তখন হবে যখন আমল করার তাকাযা ভেতর থেকে এমনি এমনি বের হতে থাকবে। অন্তরে এমন তাকাযা ও স্পৃহা জন্মাবে যে, দুনিয়ার কোনো শক্তিই সেই স্পৃহাকে দমাতে পারবে না। দুনিয়ার কোন শক্তিই ঈমানওয়ালাদের কোনো ছোট আমলকেও বাধা দিতে পারবে না।

যখন ঈমান না থাকে তখন দ্বীন তার আপন অবস্থা হতে নিচে নামতে নামতে নিরেট ফারায়েযের মধ্যেই সীমিত থাকবে। কারণ, ফারায়েয হলো কুফুর ও ইসলামের মধ্যখানে অন্তরায়।

ফরায়েয হলো কুফুর ও ইসলামের মধ্যখানে ব্যবধান সৃষ্টিকারী প্রাচীর স্বরূপ।

যদি এ ফারায়েযও মধ্যখান হতে উঠে যায় তাহলে বান্দাহ কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

অতএব, এই ফারায়েযই কুফুর ও ইসলামের মাঝে আড় স্বরূপ। একথা ভেবে নিশ্চিন্তে বসে না থাকা যে, আমরা তো নামাজ পড়ছিই। না ভাই! শুধু নামাজই তো দ্বীন নয়, শুধু ফারায়েযই তো দ্বীন নয়। ফারায়েয তো কুফুরী ও ইসলামের মাঝে আড় স্বরূপ।

যখন ঈমান না থাকবে তখন দ্বীনের মধ্যে এতই পতন চলে আসবে যে, মানুষ নিচে না মতে নামতে এত নিচে নেমে যাবে যে, তারা মনে করতে থাকবে শুধু নামাযই হলো দ্বীন। তারা ইসলামী মু'আশারাহ থেকে দূরে সরে যাবে। বিধর্মীদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ভাল লাগতে থাকবে।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যখন উম্মতের মধ্য থেকে দাওয়াত খতম হয়ে যাবে তখন সর্বপ্রথম উম্মত মু'আশারার দিক দিয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে।

নামায পড়বে কিন্তু বেশ-ভূষা থাকবে বিধর্মীদের, লেবাস বিধর্মীদের।

নামায পড়বে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য থাকবে বিধর্মীদের।

নামায পড়বে কিন্তু ঘর-বাড়ি থাকবে বিধর্মীদের।

নামায পড়বে কিন্তু বিয়ে-শাদী থাকবে বিধর্মীদের।

অথচ তারা বলতে থাকবে আমরা তো নামায পড়েই যাচ্ছি। যখন তাদেরকে কোনো নিষিদ্ধ কাজ হতে বাধা দেয়া হবে এবং কোনো ভাল কাজের জন্য বলা হবে তখন তা মেনে নেয়ার পথে সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের এ নামায। তাদের নামাযই তাদেরকে একেবারে মুতমাইন ও প্রশান্ত বানিয়ে বসিয়ে রাখবে। অথচ তার মু'আশারাহ (জীবন-যাপন পদ্ধতি তথা সভ্যতা) হয়ে আছে মুরতাদ। মেরে দোস্তো! যখন মু'আশারাহ মুরতাদ হয়ে যায় তখন চলে আসে যেহনী এরতেদাদ (মানসিকভাবে ধর্মচ্যুতি প্রবণতা)। অর্থাৎ মানুষের মন-মানসিকতা মুরতাদ হয়ে যাবে।

যেহনী এরতেদাদ কাকে বলা হয়?

যেহনী এরতেদাদ বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামকে আসবাবের মোকাবেলায় হাল্‌কা মনে করাকে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তা'আলার আহকামাতকে হাল্কা মনে করতে থাকবে। এটা একেবারেই পাকাপাকি কথা। এটা অভিজ্ঞতাও বটে যে, যখন একীন কমজোর হয়ে যায় তখন মু'আশারার মধ্যে এরতেদাদ চলে আসে। আর যখন মু'আশারার মধ্যে এরতেদাদ চলে আসে তখন যেহনী এরতেদাদ আসা শুরু হয়। তখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম মেনে নেয়া লজ্জার বিষয় হয়ে যায়।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু নামায দ্বারাই মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। মুসলমান তো জীবিত থাকবে ইসলাম দ্বারা তথা ইসলামী মু'আশারাহ অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন-যাপন পদ্ধতি দ্বারা। নতুবা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হতে যখন কোনো নবী বিদায় নিত তখন তাদের মধ্যে নামায, হজ্জ ও তাওয়াফ ইত্যাদি পূর্ববৎ বাকি থাকতো। কিন্তু শয়তান তাদের আমলের ধরনকে এতটাই পরিবর্তন করে দিত যে, তাদের আমল তাদের মু'আশারাহর মতই হয়ে যেত। এমনকি তাদের হজ্জ একটি রুসম ও রেওয়াজ হয়ে থাকতো। উলঙ্গ হয়ে হজ্জ করতো। হজ্জের মত বড় একটি এবাদত, যে কাপড় পরিধান করে হজ্জ করছে সে ছোট হজ্জ করছে আর যে উলঙ্গ হয়ে হজ্জ করছে সেই নাকি বড় হজ্জ করছে। কারণ, জাহালতের পরও আমল তো বাকি থাকবে কিন্তু আমলের রূপরেখা বদলে যাবে। আজ তো এমনই হচ্ছে। আমরা দ্বীনের উপরতো চলছি কিন্তু সমাজ ও পরিবেশকে খুশি রেখে। অথবা দ্বীনের উপর তো চলবো কিন্তু স্ত্রীর মন জুগিয়ে। ছেলে দ্বীনের উপর চলতে পিতাকে খুশি করে। মনে রাখুন! পিতার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বীনের উপর চলা হারাম। স্বামীর দ্বীনের উপর চলা স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য রেখে হারাম।

তো ভাই!মানুষ তো পুরা দ্বীনের নাম রেখেছে নামাযকে। অথচ তার কাছে যা আছে তা তো ঈমানের সর্বশেষ বস্তু। এরপর তার কাছে আর কিছুই নেই। কারণ, যে নামাযকে অস্বীকার করলো সে তো কুফুরী করলো। হ্যাঁ! দোকানের মোকাবেলায় নামাযকে হাল্‌কা মনে করা যে, নামায হলো একীনি সবব (নিশ্চিত উপকরণ) আর দোকান গায়রে একীনি (অনিশ্চিত উপকরণ) সবব।

ঈমানওয়ালারা কি নামাযকে অস্বীকার করবো? কখনো না। ঈমান ওয়ালারাতো নামাযের অস্বীকার করবে না। কারণ, তাদের উপর তো নামায ফরয হয়ে আছে। তবে অস্বীকার করবে নামাযের ফযিলতের।

নামায কিভাবে রুজির ব্যবস্থা করবে? নামায কিভাবে রোগ-ব্যাধি দূর করবে? নামায দ্বারা কিভাবে স্বাস্থ্যের হেফাজত হবে?

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকে অস্বীকার করাই কুফুরী। অন্যথায় নামাযের অস্বীকার তো কোন বে-ঈমান লোকও করে না। সেও তো বলে থাকে, নামায খুব ভাল জিনিস। উপরন্তু আমরা আমাদের একীন নষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাকে অস্বীকার করছি। এ অস্বীকারই কুফুরী। অর্থাৎ সে এমন পথে পড়ে আছে যে, চলতে চলতে সে নিশ্চিত কুফুরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। কারণ, নামাযের অস্বীকার এবং নামাযকে হাল্কা মনে করা মানুষকে কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এখন তার জন্য আর কোনো আড় বাকি থাকলো না যা তাকে কুফুরী থেকে বাঁচাবে।

তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গো! কালিমার দাওয়াত যখন উম্মত থেকে বিদায় নিবে তখন সর্বপ্রথম মু'আশারাহ মুরতাদ হয়ে যাবে। এরপর মুরতাদ হবে তার কলব। কেননা, যখন একীন ঠিক থাকবে না তখন সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজকে খুশি রেখে চলতে থাকবে। এবং তার দ্বীনদারিও হয়ে যাবে তার যুগোপযোগী। বলতে থাকবে, অবস্থা ও পরিস্থিতি এমন এমন, তাই সেই অনুপাতেই দ্বীনের উপর আমল করা উচিত। এই আধোরা দ্বীনের ুপর চলার কারণেই তার উপর নানা ধরনের সমস্যা এসে পড়ছে, পেরেশানী আসছে এবং বিফলতা হানা দিচ্ছে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! পেরেশানী আসার একটি কারণ হলো বেদ্বীনির কারণে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আধোরা দ্বীনের উপর চলার কারণে। আজ আমাদের দ্বীন হলো নাকেস তথা অসম্পূর্ণ। এর দ্বারা পেরেশানীই আসবে। নামায পড়া সত্ত্বেও আমাদের জীবনে অশান্তি ও পেরেশানী আসবে। নামাযও পড়ছি, সমস্যাও আসছে।

কারণ, লোকেরা চায় যে, আমি আমার মত দ্বীনের উপর চলব। তাহলেই পরিপূর্ণ কামিয়াবী পাওয়া যাবে। এরপরেই সে এই শেকায়াত করবে যে, আমি নামায তো পড়ছি কিন্তু এই এই সমস্যা আমাকে ঘিরে করে আছে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! আপন হালাত তথা সমস্যাকে সব সময় নিজ আমলের সাথে জুড়তে থাকুন। এরপর এ সমস্যাগুলোই আমাদের ভেতর থেকে ঐ সকল বদ আমলগুলোকে বেছে বেছে বের করে দিবে যেগুলো দ্বারা আমাদের জীবনে সমস্যা আসছে। আর যখন সমস্যাগুলোকে আসবাবের সাথে জুড়া হবে তখন তো দ্বীন থেকে আরও দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, ব্যবসা ছাড়া চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসবাব ছাড়া চলার মত অবস্থা এখনো আমার হয়নি। লোন না নিয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপরই আসবাব তাকে সবুজ বাগান দেখিয়ে দেয়।

তাই মেরে দোস্তো! নিজ সমস্যাগুলোকে নিজ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখুন। এটা প্রত্যেকেরই ভাবার বিষয়। যখন নিজ সমস্যাগুলোকে নিজ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখবেন তখনই এ সমস্যাগুলো তরবিয়ত করতে সহায়ক হবে। আর যদি সমস্যাকে আসবাবের সাথে জুড়া হবে তখন আসবাব মানুষকে দ্বীন ইসলাম হতে দূর করতে থাকবে। মনে এ ওয়াসওয়াসা আসতে থাকবে যে, আমার অবস্থা এখনো দাওয়াতের মেহনত করার ও শিখার হয়নি। কিছু আসবাব বানিয়ে নেই এরপরই দাওয়াতের মেহনত শিখবো।

মেরে দোস্তো! আসবাব পেয়ে যাওয়ার নামই দ্বীন নয়। দ্বীনের মাধ্যমে দ্বীন আসে। আসবাবের মাধ্যমে দ্বীন আসবে না যে, প্রথমে আসবাব বানিয়ে নেই এরপর দ্বীন শিখবো। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নীতি এটা ছিল যা যে, প্রথমে আসবাব বানিয়ে নিব এরপরই দ্বীনী শিখবো। বরং সাহাবায়ে কেরামগণ অভাব-অনটনে ডুবে থেকেও দ্বীন শিখতেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আসবাবও দিয়েছিলেন। এক সাহাবী দুই দুই বেলা না খেয়ে আহার ক্লীষ্টে জীবন যাপন করতেন। তিনি এক সময় চল্লিশ হাজার দেরহামের যাকাত আদায় করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন আসবাব দিয়ে দিয়েছেন যে, মাটিতে হাত লাগালেও সোনা হয়ে যেত। দেশ বিদেশে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তিনি ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

পক্ষান্তরে ঐ সম্প্রদায় যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল যে, আমরা প্রথমে আসবাব বানিয়ে নেই, এরপর দ্বীন শিখবো এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, যদি আসবাব পাওয়ার পরও তোমরা পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের উপর না চলো তাহলে তোমাদের উপর ভয়াবহ আযাবের অবতারণা ঘটবে।

মেরে দোস্তো! যারা দ্বীনের উপর চলার জন্য আসবাব তালাশ করবে তারা আসবাব পেলেও দ্বীনের উপর চলবে না। কারণ, আসবাব ছাড়া দ্বীনের উপর যতটুকু চলা যেত আসবাব আসার পরে ততটুকুও দ্বীনের চলা সম্ভব হয় না। কারণ, সে তো দ্বীনের পরিপূর্ণ বিষয়কে আসবাবের উপরই নির্ভরশীল বানিয়ে রেখেছে। মনে রাখতে হবে।

দোকানোর সাথে নামাযের কোনো সম্পর্কে নেই।

মালের সাথে নামাযের কোন সম্পর্ক নেই।

নামাজের সাথে আসবাবের কোনো সম্পর্ক নেই।

কি ভাই! নামাযের জন্য কি কোনো সবব দরকার আছে যে, আসবাব হলে নামায পড়বো নয়তো না? দুনিয়ার কোনো বস্তু এমন নয় যার উপর নামায নির্ভরশীল হয়। নামাযের ভেতরকার কোনো আমল এমন নেই যার জন্য কোনো সবব প্রয়োজন হয়। যদি কোনো লোক আপাদমস্তক বিবস্ত্র ও উলঙ্গ হয়, কোনো কাপড়-চোপড় না থাকে তবুও তার উপরও নামায ফরয কি না? যার নিকট মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি সুতরাও নেই তার উপরও নামায ফরয। যেমনিভাবে আপাদমস্তক ঢাকা লোকের উপর নামায ফরজ ঠিক তেমনি উলঙ্গ ও বিবস্ত্র ব্যক্তির উপরও নামায ফরজ। তবে ইসলামী শরীয়ত তার নামায আদায় করার ভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে।

এমন নয় যে, তোমার কাপড় নেই তাই তোমার নামায মাফ।

এমনও নয় যে, যার কাছে শরীর ঢাকার মত কাপড় আছে শুধু তার উপরই নামায ফরয।

যার নিকট সফরে মাল খরচ করার সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্জ করা ফরজ। আর যার নিকট সফরে মাল খরচ করার সামর্থ্য নেই তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

যাকাত ফরয ঐ ব্যক্তির উপর যার নিকট মাল আছে।

কিন্তু তার কাছে কাপড় নেই তার উপরও নামায ফরয। মেরে দোস্তো বুযুর্গো! প্রথমে আসবাব হবে এরপরই দ্বীন হবে যে এমন কথা নবীর দরবারে নিয়ে আসে সে তো ঐ লোক যার দ্বীনের উপর চলার কোনো লক্ষ্যই নেই। যার ভাগ্যে মোটেও ঈমান নেই আল্লাহ তা'আলা তাকেই আসবাব দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আযাব দেয়ার জন্য। আর যারা দ্বীনের উপর চলার জন্য আসবাব প্রত্যাশা করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। আর যদি আসবাব পাওয়ার পরও তারা দ্বীনের উপর না চলে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠিন আযাব প্রদান করেন।

তাই মেরে দোস্তো! মনে রাখতে হবে, আসবাবের মাধ্যমে দ্বীন আসে না।

দ্বীন কি আসবাবের মাধ্যমে আসে?

যারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম পুরা করবে আল্লাহ তা'আলা আসবাবকে তাদের অনুকূল বানিয়ে দিবেন।

তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গো! সর্বপ্রথম আমাদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান শিখতে হবে। কারণ, ঈমানওয়ালাদের আলামত এটাই যে, ঈমানওয়ালা আপন হালতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবে। সে মনে করবে, আমার জীবনের সমস্যাগুলো আমারই বদ আমলের ফল। কখনো আল্লাহ তা'আলা হালাত আনেন নামাযী হওয়া সত্ত্বেও। এর কারণ, সে যতটুকু দ্বীনের উপর চলছে সে ততটুকুকেই দ্বীন মনে করছে। অথচ দ্বীন তো পূরো দ্বীন। কেউ কেউ দ্বীন মনে করে বসে আছে ততটুকুকে যতটুকুর উপর সে আমল করতে পারবে।

লোকেরা এসে শেকায়েত করে থাকে যে, আমি নামাযী, আমার পরিবারের সদস্যরাও নামাযী, এরপরও আমার জীবনে নানা সমস্যা পর পর লেগেই আছে। আল্লাহ তা'আলা নামাযী হওয়া সত্ত্বেও কামিয়াব করলেন না। এর কারণ কী? আবার কেউ এসে এ অভিযোগ করে বসে, আমি তো মাত্রই নামায পড়ে বের হচ্ছিলাম পুলিশ এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে ফেললো। অথচ আমি তো এক নিরপরাধ লোক ছিলাম।

মেরে দোস্তো! যেমনিভাবে বে-দ্বীনির কারণে সমস্যা ও পেরেশানী এসে থাকে ঠিক তেমনি নাকেস দ্বীন তথা আধোরা দ্বীনের কারণেও সমস্যা ও পেরেশানী এসে থাকে। আজ তো আমরা নাকেস দ্বীনের উপর চলছি।

আমাদের দ্বীন নাকেস। তাই আজ আমাদের অন্তরে দ্বীনের পথে কামিয়াবীর পুরা একীন নেই।

অতএব, মেরে দোস্তো! আমরা তো খুব ঈমানের কথা ও এক্বীনের কথা শুনে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের একথা জানা হলো না যে, আমাদের ঈমান বনবে কিভাবে?

ঈমান বনবে ঈমানের দাওয়াতের মাধ্যমে।ঈমান বনবে ঈমানের মেহনতের মাধ্যমে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাগণকে কালিমার দাওয়াতের উপর উঠিয়েছেন। তাই তারা প্রত্যেকেই দায়ী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই এ কাজ ছিল যে, এসো, বসো, ঈমান আনি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল এবং হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের প্রত্যেক দিনের মজলিস ছিল, এসো, বসো, ঈমান আনি।

এই ঈমানের দাওয়াত, ঈমানের হাল্‌কা ও গায়েবের আলোচনা করার প্রথা আমাদের মধ্য হতে একেবারেই খতম হয়ে গেছে। আমি তো বলে থাকি, সাধারণ লোকদের থেকে তো খতম হয়ে গেছেই। খোদ দাওয়াতের মেহনত করনেওয়ালা দা'য়ীদের থেকেও বিদায় হয়ে গেছে।

আমি সত্যিই বলছি, প্রতি বছর চার মাস লাগানেওয়ালা, মাসে তিন দিন লাগানেওয়ালা, প্রত্যহ আড়াই ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা লাগানো ওয়ালাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, আপনাদের ঈমানের হাল্‌কা হয় কখন? তখন উত্তরে না ছাড়া কোনো উত্তর পাবেন না। ছয় নাম্বার তো শুধু গণনার মধ্যেই থেকে গেছে। অথচ প্রত্যেক নাম্বারের মেহনত হওয়া উচিৎ ছিল। প্রথম নাম্বারটি সকল নাম্বারের সাথে জড়িত। এ নাম্বারের মেহনত হলো দাওয়াত ও দাওয়াতের হাক্বীকত অন্তরে জন্মানো। আমি একথাও বলে থাকি যে, প্রতিদিন নিজ ঘরে আপন বিবি-বাচ্চার সাথে কতটুকু সময় ঈমানী হাল্‌কা কায়েম করার পেছনে ব্যয় করছেন। আর কখনই বা তা করছেন? বলুন দেখি।

আমি মসজিদওয়ার জামাতের সাথী, আমি চার মাস লাগানেওয়ালা সাথী, আমিই আমাকে প্রশ্ন করি, আমার চব্বিশ ঘন্টার মধ্য হতে কোনো সময়টি এমন ব্যয় হয় যে, আমি আমার বিবি-বাচ্চার সাথে বসে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী নেযামের আলোচনা করে থাকি।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! সত্য কথা হলো এটাই যে, আমরা আজ পর্যন্ত ঈমান বানানোর এরাদাই করিনি। আমরা তো একথা মনে করছি যে, দাওয়াতের অর্থই হলো, কেউ বসে বয়ান করবে আর বাকিরা শুনতে থাকবে। না মেরে দোস্তো! ঈমানের দাওয়াতের মাকসাদ (উদ্দেশ্য) হলো, প্রত্যেক লোক যেন তার ঘর থেকে শুরু করে আলমী (আন্তর্জাতিক) পরিসরের প্রত্যেক উম্মতকে তাদের ঈমানী তারাক্বীর (উন্নতির) দাওয়াত দিতে থাকে। প্রত্যেক লোক তার ঈমানের তারাক্বীর জন্য অন্যকে ঈমানের দাওয়াত দিবে। এটাই ছিল দাওয়াতের মূল মাকসাদ (উদ্দেশ্য)।

জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় ঈমান বানানোর এক ব্যাপক ফেযা (পরিবেশ) ছিল। ছিল কালিমার দাওয়াতের আম পরিবেশ। সে যুগে ইসলাম থেকে কেউ পালাতে চাইলেও পালানোর অবকাশ ছিল না। দাওয়াত দেনেওয়ালাদের থেকে ছুটতে পারতো না। আর যদি কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে চাইতে তাহলে সে দেখতে পেতো কালিমা শিখানেওয়ালারা মসজিদে সর্বক্ষণ অপেক্ষমান আছে। কি অবাক কাণ্ড!

দাওয়াত এমন এক পরিবেশ বানিয়ে রেখেছিল, এমন এক বন্ধনি বানিয়ে রেখেছিল, এমন এক মজবুত ঘাঁটি বানিয়ে রেখেছিল যে, যদি কোনো একজনও ইসলাম হতে বের হয়ে যেতে চাইতো তাহলে তার পক্ষে ইসলাম হতে বের হওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজ উম্মতে মুসলিমা থেকে দাওয়াত বিদায় নেওয়ার কারণে মুসলমানদেরও ইসলাম থেকে বের হওয়া সহজ হয়ে গেছে।

হযরত বলতেন, উম্মত যখন কালিমার দাওয়াত ছেড়ে দিবে তখন অমুসলিমদের দ্বীন-ধর্ম ও তাদের কৃষ্টি-কালচার মুসলমানদের নিকট ভাল লাগা শুরু হবে আর নিজের দ্বীন-ইসলাম তাদের কাছে খারাপ লাগতে থাকবে। যদি কোনো একজন লোক ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো সে একজন মসজিদওয়ারী সাথী তাহলে চাই সে একজন নৌকার মাঝিই হোক না কেন, অথবা একজন দোকানদার হোক না কেন, অথবা একজন চাষি হোক না কেন তার ব্যাপারে মসজিদওয়ার সাথী সকলেই খবর রাখতো। কত মূল্য ছিল একজন লোকের নিরেট দাওয়াতের কারণে।

কিন্তু আজ দেশের পর দেশ, অঞ্চলের পর অঞ্চল, প্রদেশের পর প্রদেশ, গ্রামের পর গ্রাম দলবদ্ধভাবে লোকেরা ইসলাম ধর্ম হতে বের হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোন খবরও নেই। কারণ, আমরা আজ হয়ে গেছি বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় দোকানদার ও বড় বড় জমিদার। সেও ঐ লোক সম্পর্কে অবগত থাকে। মানুষের এত মূল্য ছিল একমাত্র দাওয়াতের কারণে।

অথচ আমরা ব্যবসায়ী হলাম পরে, আর প্রথম পরিচয় হলো আমরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত। দোকানদারও পরে হয়েছি। জমিদার হয়েছি পরে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেদায়াতের জিম্মাদারি দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমাদেরকে কালিমার দা'য়ী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অথচ আমরা একথা বলে বেড়াচ্ছি, মিঞা! হেদায়াত তো আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে। হেদায়াত দেয়া না দেয়া তাঁর ব্যাপার। তাঁর হাতেই রয়েছে গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার চাবিকাঠি। পথভ্রষ্ট করা না করা তার ব্যাপার।

না বিষয়টি এমন নয়, বরং মূল বিষয় হলো, মেরে দোস্তো!

মানুষই মানুষের হেদায়াতের যরি'আ বা মাধ্যম।

কালিমার দাওয়াতের মেহনত যখন করা হবে তখনই মানুষের আসল মূল্য ফুটে উঠবে।

কালিমার দাওয়াত মানুষের অন্তরে উম্মতের দরদ জন্মাবে। কালিমার দাওয়াত মানুষের অন্তরে মানবজাতির গুরুত্ব পয়দা করবে।

কালিমার দাওয়াত যখন উম্মত হতে বিদায় নিবে তখন উম্মতের ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়া এতই সহজ হয়ে যাবে যে, প্রথমত এটা বুঝাই দায় হয়ে যাবে যে, মানুষের মধ্যে কতটুকু ইসলাম আছে। আর থাকলেও বা কে কোন হালতে আছে।

কেননা আমি তো ব্যবসায়ী, আমি তো বাণিজ্যিক লোক। আমার নিকট এতো সময় কোথায় যে, এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করবো। আর হেদায়াত তো আল্লাহ তা'আলার হাতে।

ভাই! বিষয়টি এমন নয়, বরং বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হেদায়াতের যরি'আ বানিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানের প্রত্যেক সদস্যের

হেদায়াতের মাধ্যম তুমি। মুসলমান যখন কালিমার দাওয়াত নিয়ে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হেদায়াত নাযিল হওয়া শুরু হবে। মানুষ আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হতে থাকবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঈমান-ইসলাম নিয়ে নিজ নিজ দোকানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্ষেত-খামারে এমনভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকি যে, মিঞা! আমরা তো আমল করেই যাচ্ছি, আমরা তো নামায পড়েই থাকি এবং আমরা তো তাসবীহ-তাহলীল আদায় করেই থাকি তাহলে মনে রাখতে হবে যে, কসম খোদার! এ উম্মত দাওয়াত দেয়া ছাড়া নিরেট আমলের ভিত্তিতে নাজাত পেতে পারবে না। বড় কঠিন কথা এটা। লোকেরা তা বুঝছে না। তাই শুধুই জটিলতার পয়দা করছে।

আমি আরো কসম খেয়ে বলছি, ওলামায়ে কেরাম পরিস্কারভাবে লিখেছেন।

"এ উম্মতের দায়িত্ব হলো নিজ ঈমান-আমলের পাশাপাশি অন্যের ঈমান-আমলের ফিকিরও করা চাই। যদি নিজ ঈমান আমলের পাশাপাশি অন্যের ঈমান-আমলের ফিকির না করা হয় তাহলে নিরেট নিজ আমল দ্বারা নাজাত পাওয়া যাবে না।"

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন নামক গ্রন্থে মুফতী শফী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন–

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

কসম আসরের সময়ের! সমগ্র মানব জাতির ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তা হতে মুক্ত তারাই যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, পরস্পর সত্যের দাওয়াত দিয়েছে এবং ধৈর্যের তালকীন করেছে।

আজ লোকেরা জিজ্ঞেস করবে, সকলকেই কি এ কাজ করতে হবে?

দাওয়াত দেওয়া কি ফরযে আঈন?

তাহলে কি ফরযে কেফায়া?

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন আবূ জাহেলের পুত্র। আল্লাহ তা'আলা তার হেদায়াতের

যরী'আ বানালেন এক জাহাজের কাপ্তানকে। তিনি বড় কোন ব্যক্তি ছিলেন না। কোন আলেম ছিলেন না। বরং ছিলেন সাধারণ এক লোক। ঐ কাপ্তানের দাওয়াতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়াত দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ইসলামের শত্রু আবু জাহেলের পুত্র। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার কথা ছিল, হয়তো আমি মুসলমানের হাতে বধিত হয়ে যাবো নয়তো আমকে ইসলামের কাছে হার মেনে ইসলামই গ্রহণ করতে হবে। তাই ইয়েমেনে ভেগে যাই। কথা মত তিনি ভেগে পালালেন। জাহাজে আরোহণ করে যাত্রা করলেন ইয়েমেন অভিমুখে। চলতে চলতে হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ তুফান চলে আসলো। তুফানী ঝঞ্ঝা বায়ু জাহাজকে বারবারই আঘাত হানতে থাকলো। জাহাজ ঘুরপাক খেতে থাকলো। জাহাজের যাত্রীরা সকলেই এক দুরবস্থায় শিকার হলো। উল্লেখ্য যে, এ দুরবস্থা সমুদ্র বা বাতাসের কোনো মাখলূক ছিল না। বরং সবই তো আল্লাহ তা'আলার মাখলূক। এ অবস্থা কেন আসলো? জাহাজ আরোহীরা তৎক্ষণাৎ এ অবস্থাকে আমলের সাথে জুড়লো। তারা শুধু এতটুকুই মনে করেনি যে, আমরা তো ঈমান এনেছিই। আমরা তো কালিমা পড়েই নিয়েছি। বরং সেখানকার সকল নারী-পুরুষ ও শিশু-বালককে এ এক্বীন শিখানো হলো যে, এ কঠিন বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মুক্তি দিবেন। এই কালিমাই উদ্ধার করবে। সেখানকার নতুন-পুরাতন, নারী-পুরুষ সককেই এই এক্বীন শিখানো হলো।

হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাঁতারও জানতেন। তাই তিনি হাজাজের কাপ্তানকে বলতে শুরু করলেন, ভাই! আমার বাঁচার উপায় কী হবে? এ বিপদ থেকে বাঁচার কোন উপায় আছে কী?

কাপ্তান মশাই বলতে লাগলেন, জাহাঁপনা! পানি আপনাকে ডুবাবে না। আপনি পানি থেকে বেঁচে যেতে পারবে। এর সহজ পদ্ধতি হলো, তুমি কালিমায়ে এখলাস পড়ে নিন। বেঁচে যাবেন।

ইকরামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতে লাগলেন ভাই! আমি তো সাঁতারও জানি না। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে যাচ্ছে ভাব। আমি তো নিশ্চিত ডুবে যাবো। কাপ্তান বললো, ভাই! আপনি কিভাবে ডুববেন অথচ আপনি কালিমায়ে এখলাস পাঠ করে নিয়েছেন।

হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেহেতু ইসলাম গহণ করেছিলেন না তাই তিনি বললেন যে, ভাই! কি সেই কালিমায়ে এখলাস? তুমি তো আমাকে বলে যাচ্ছো কালিমায়ে এখলাস পড়ে নিন, বেঁচে যাবেন। আমাকে বলে দাও যে, কালিমায়ে এখলাস কি?

কাপতান বললো, ভাই! আপনি কি জানেন নাযে, কালিমায়ে এখলাস কী?

ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, না ভাই! আমি আসলেও জানিনা যে, কালিমায়ে এখলাস কী।

কাপ্তান বলো, বলে নাও–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

হযরত ইকরিমা রাযিয়ালাল্লাহু তা'আলা আনহু বলতে লাগলেন, হায় হায়! আমি তো এই কালিমার ভয়েই ভেগে পালাচ্ছি। এ পালাতে গিয়েই তো তোমাদের এ জাহাজে সওয়ার হয়েছি।

কাপ্তান বললো, আচ্ছা তুমি কি একারণেই ভেগে পালাচ্ছো? যাও, ফিরে যাও।

লক্ষ্য করে দেখুন! কাপ্তান তাকে কালিমার দাওয়াত দিলো। তাকে ফেরত এনে তার স্ত্রী উম্মে হাকীমের হাতে হাওয়ালা করল। অতঃপর তার স্ত্রী তাকে নিয়ে যহরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাযির হলেন। তথায় হাযির হয়ে তিনি কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকার করে নিলেন। জনাব নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে সেই কাপ্তানের পক্ষ হতে দাওয়াতপ্রাপ্ত মুসলমান এসে যেই শব্দ দ্বারা তার ইসলামের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো এ শব্দ অন্য কোনো সাহাবী ইসলাম গ্রহণের সময় বলেননি। ঐ কাপ্তানের দাওয়াত পেয়ে হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণকালে কী বলে ছিলেন?

মেরে দোস্তো! কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে তিনটি বিষয় জন্ম নেয়।

১. এতা'আত (আনুগত্য)

২. কালিমার মেহনত

৩. হিজরত প্রবণতা।

উম্মতের মধ্যে জিহাদের যোগ্যতাও দাওয়াতের মাধ্যমে পয়দা হয়ে থাকে। হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন বলেছিলেন–

إِنِّيْ مُسْلِمٌ مُجَاهِدٌ مُهَاجِرٌ

আমি মুসলমান, মুজাহিদ ও মুজাহির।

এ শব্দ কোনো সাহাবীর মুখ দিয়েই বের হয়নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল সাহাবাই যেমন ছিলেন মুসলমান, তেমনি মুজাহিদ ও মুহাজির। কিন্তু এ শব্দটি ইসলাম গ্রহণ করার সময় একমাত্র হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ই বলেছিলেন।

إِنِّيْ مُسْلِمٌ مُجَاهِدٌ مُهَاجِرٌ

আমি মুসলমান,মুজাহিদ ও মুহাজির।

মুসলমান বলা হয় যে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজেকে সঁপে দিয়ে থাকে।

মুজাহিদ বলা হয় তাঁকে যে দাওয়াতের তাকাযা পূরণের জন্য সকল বস্তুকে কুরবানী করে দিয়ে থাকে। এমনকি নিজ প্রাণকেও উৎসর্গ করে দেয়।

আর মুহাজির বলে থাকে যে প্রত্যেক ঐ বস্তু যা হতে আল্লাহ তা'আলা বাধা প্রদান করেছেন তা হতে নিজেকে বিরত রাখে। দাওয়াতের তাকাযায় যদি নিজ ঘরকেও পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হয় তাহলে সে ঘরও ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সুতরাং হযরত ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এটাই বলেছিলেন যে,

আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

আমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করেছি।

আমি আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের মেহনত করনেওয়ালা।

আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করনেওয়ালা।

এ যোগ্যতা পয়দা হয়েছে কালিমার এখলাসের কারণে, যা তার মধ্যে তৈরি হয়েছে একমাত্র ঐ কাপ্তানের দাওয়াতের মাধ্যমে।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! এই যে মেহনত চলছে তা হলো কালিমার দাওয়াতকে মুসলমানের জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য। কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ দ্বীন হাক্বীকতের সাথে মুসলমানের জীবনে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আর এটা হয়ে থাকে মানুষের অন্তরের ভেতরগত তাকাযার দাবিতে। এখনও আমাদের দ্বীন আধোরা। সাময়িক ও এক্বীন এখনও আসেনি। এ এক্বীনের সম্পর্ক হলো কালিমার দাওয়াতের সাথে। কালিমার দাওয়াতের সাথে হলো কালিমার মেহনতও। এ দাওয়াতই প্রত্যেক নবীর মাকসাদ ও উদ্দেশ্য।

কালিমার দাওয়াত থেকে এক্বীন।

এক্বীন থেকে আমল।

আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যমে কামিয়াবি।

আর আমরা মেহনত করে যাচ্ছি আসবাবের উপর।

আসবাবের মেহনতের মাধ্যমে আসে এক্বীনের খারাপী।

এক্বীনের খারাপীর মাধ্যমে আসে আমলের খারাপী।

আমালের খারাপীর মাধ্যমে আসে আল্লাহ তা'আলার নারাযেগী।

আর আল্লাহ তা'আলার নারাযেগীর মাধ্যমে আসে নানা ধরনের সমস্যা ও বিপদ-আপদ।

ভাই! আমাদের মেহনতের সংক্ষিপ্ত রাস্তা হলো এটাই।

তাই তো মেরে দোস্তো, আযীযো বুযুর্গো! আমাদের মেহনতের রোখ পাল্টাতে হবে। উম্মত যেন তাদের নিজ নিজ মেহনতের রোখ পরিবর্তন করে নেয়। এ জন্য আমাদের কালিমার দাওয়াতকে যিন্দা করতে হবে। আর কালিমার দাওয়াতকে যিন্দা করতে হলে প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে ঈমানের হাল্‌কা কায়েম করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার গায়বী নেযামের আলোচনা করতে হবে। সে জন্য অনেক উঁচা উঁচা দাওয়াত দাও। সর্বোচ্চ ঈমান তথা সাহাবাদের ঈমানের দিকে দাওয়াত দাও, তাহলে ইনশাআল্লাহ উম্মত তাদের মেহনতের রোখ পাল্টে দিবে ভাই! পরিবেশ ও মজমা অনুকূলে বলবেন না। প্রত্যেক নবীকে পাঠানো হতো বিগড়ে যাওয়া নষ্ট পরিবেশেই। তারা এসে কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে পরিবেশ তৈরি করে নিতেন। পরিবেশ অনুযায়ী দাওয়াত পেশ করতে না।

মেরে দোস্তো! কালিমার দাওয়াত ছেড়ে দেয়ার কারণে উম্মতের মধ্যে এ ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে, মাহাওল (পরিবেশ) অনুযায়ী ও মজার রুচি অনুযায়ী দাওয়াত দেয়া চাই। না, বরং সকল নবীই সকলের নিকট কালিমার দাওয়াতই দিয়েছেন। কথা মানা আর না মানা এটা নবীর দায়িত্বে ছিল না। কালিমার দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমেই দাওয়াত দেনেওয়ালার একীন বনবে। মাহোল (পরিবেশ) বনবে। হ্যাঁ, এই উভয় ফলাফল হলো কালিমার দাওয়াতের। কালিমার দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হলো এ দুটি।

তাই মেরে দোস্তো! দাওয়াতের মেহনত করে আমাদেরকে উম্মতের মেহনতের রোখ বদলাতে হবে। যাতে প্রত্যেক ঈমানওয়ালাই ঈমান ও আমলের হাক্বিকত অর্জন করতে পারে। প্রত্যেকেই ঈমান ও আমলের মেহনত করনেওয়ালা বনে যায়।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, এখন পর্যন্ত দাওয়াতের যে মেহনত চলছে তা তো নবীওয়ালা মেহনতকে উম্মতের মধ্যে যিন্দা করার মেহনত। উম্মত যেন প্রথমে এ কাজকে বুঝে নেয়। এ মেহনত যখন উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাবে। ব্যাপকভাবে উম্মতের মধ্যে ঈমানের হাল্‌কা কায়েম হবে।

ব্যাপকভাবে উম্মতের মধ্যে আমলের হাক্বীকত অর্জনের ফিকির চলে আসবে তখনই আল্লাহ তা'আলার উম্মতের উপর ঐ সাহায্য করবেন, ঐ বরকত প্রদান করবেন, ঐ রহমত বর্ষণ করবেন যা তিনি হযরত সাহাবায়ে কেরামের যমানায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উম্মতের মধ্যে মেহনত যিন্দা করার দরুন যাহেরের খেলাফ প্রকাশ করেছিলেন– আজও তাই প্রকাশ পাবে। মেরে দোস্তো! এখন দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, এটা তো হলো ঐ বরকত মাত্র যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছিল। বকরির স্তনে দুধ চলে আসা, এটা নবুয়াতপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। এটাতো ঐ বরকত মেরে দোস্তো! যদ্বারা বাতেলের কোমর ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ তাদের মাঝে কম্পন চলে আসা, তাদের যমিনের উপর পল্টি খাওয়া এগুলো সবই হলো হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেকার বরকত তথা তাঁর জন্মের পরবর্তী ঘটনাবলি।

তখনও তো কাজই শুরু হয়নি। যখন কাজ শুরু হবে তখন কী হবে?

তখন তো তা-ই হবে যা হয়েছে খন্দকে।

তখন তো তাই হবে যা কায়সার ও কাসরার ব্যাপারে সাহাবাদের সাথে হয়েছে।

কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বাতিলকে ধরবেন তখন ঈমানওয়ালারা কালিমার দাওয়াতের উপর একত্র হয়ে যাবে। কেন?

কারণ হলো, মেরে দোস্তো বুযুর্গো! আল্লাহ তা'আলা বাতেলকে হক্কের কারণে ধরে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তার সকল ওয়াদাকে বণি ইসরাঈলের ক্ষেত্রে পূরণ করেছেন। তিনি সবরের সাথে কাজ নিয়েছেন। সবরের অর্থ কি এটাই ছিল যে, আমরা মার খেয়েই যেতে থাকবো আর কাফেররা আমাদেরকে মেরেই যেতে থাকবে? না ভাই! বিষয়টি এমন নয়। সবর একে বলা হয় না। সবর বলা হয়, সর্বপ্রথম নিজ খাহেশের মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম পুরা করা। এটাই হলো সবর।

এ কারণেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজাকে সবর বলে আখ্যা দিয়েছেন। রোযাই একটি সবর। তা কেন? কারণ, রোযা তাকে খাওয়া থেকে বিরত রাখলো। সবরের বদলা হলো জান্নাত। রোযাদার জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক দরজা দিয়েই রোযাদারদেরকে ডাকতে থাকবে। তাই মেরে দোস্তো! ঈমান বনবে ঈমানী মেহনতের মাধ্যমে। এই ঈমানের মোকাবেলায় যখন বাতেল দাঁড়াবে তখন বাতেল মার খেতে থাকবে। হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমল দ্বারাও বাতেল পরাজিত হবে না যে, আমরা চাবো যে, আমাদের নামায দ্বারা বাতেলের মোকাবেলা হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয়।

সর্বপ্রথম কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে একীন বনবে।

এরপর একীনের মাধ্যমে এমন নামাজ বানাবে যে এই নামাযই বিধর্মীদের মোকাবেলা করবে। ঐ নামাযের মোকাবেলায় বাতেল হার মেনে যাবে।

কিন্তু ভাই! এখন তো বিষয়টিই হয়ে গেছে অন্য রকম। হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি তো বলতেন, বাতেল আমলের মোকাবেলায় কখনো নাকাম হবে না। কারণ, তাদের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, তাদের নষ্ট

এক্বীন দ্বারা তাদের আমল পয়দাই হবে না। আর তাদের নষ্ট এক্বীনের ঐ আমল দ্বারা বাতেল পরাজিত হবে কিভাবে?

তাদের খুব ভাল করে জানা আছে যে, আমাদের আমল, আমাদের আসবাব, আমাদের কামাই-উপার্জন, আমাদের প্রস্তুত পণ্যসামগ্রি যা ঈমানওয়ালারা ব্যবহার করছে তা দ্বারা তাদের নামাযে ঐ জান আসতে পারে না যা সাহাবাদের নামাযে বিদ্যমান ছিল।

হ্যাঁ! যদি সেই প্রাণ আমাদের নামাযের মধ্যে বিদ্যমান থাকতো তাহলে অবশ্যই আমাদের নামায বাতেলের মোকাবেলা করতো। তারা তো খুব ভাল করেই জানে যে, আমাদের নাকামী ও বিফলতার মূল কারণ কী।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! সেকালে তো বাতেল এমনি এমনি মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। মোকাবেলা করার সাহসই তো দেখাতো না। তারা ঈমানওয়ালাদের সাথে কি মোকাবেলা করতে আসবে, তাদের নিকট তো কোনো আকল-বুদ্ধিই ছিল না। নতুবা মুশরিকরা তো নিজেরাই একথা বলেছে, যেমন হুরুমজান বলেছিল, যে দিন থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে হয়ে গেছে সেদিন থেকে আমরা তোমাদের নিকট পরাজিতই হয়ে আসছি। অন্যথায় যে দিন পর্যন্ত আমরা তোমরা একই রকম ছিলাম তখন তো আমরাই বিজয় লাভ করেছিলাম আর তোমরা পরাজিত হয়েছিলে।

কে বলছে একথা? এক মুশরিক। যার নাম ছিল হুরমুজান। সে বলেছিল, তোমরা তো আমাদের গোলাম হয়েছিলে। কিন্তু যে দিন থেকে তোমাদের রব তোমাদের সঙ্গী হয়ে গিয়েছে সেদিন থেকে আমরা পরাজিত হয়ে আসছি। দেখুন এক মুশরিক বলছে সাহাবাদেরকে। কারণ, হক্ব তো বাতেলের উপর সব সময়ই গালেব ও জয়ী থাকবে।

এখন মোকাবেলা করার সাহস করছে। এর কারণ হলো, তাদের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, তোমাদের আমলগুলো এ যোগ্য নয় যে, বাতেলকে প্রতিহত করতে পারবে। বাতেলকে হার মানানোর মত যা যা উপকরণ রয়েছে তার সব কিছুর ব্যাপারেই বাতেলের জ্ঞান রয়েছে যে, বাতেলের বিপক্ষে হক্ব কখন কখন জয়যুক্ত হয়।

মেরে দোস্তো! দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বানান। আল্লাহ তা'আলা বাতেলকে আমলের মোকাবেলায় নয় বরং ঈমানের মোকাবেলায় নাকাম করবেন। কথাটিকে মনে রাখবেন। নয়তো বাতেল আমলওয়ালাদেরকেও হার মানিয়ে দেয়। এর কারণ হলো, আমল করনেওয়ালাদের মাঝে আমল তো আছে কিন্তু আমলের মধ্যে কামিয়াবী আসার শতভাগ এক্বীন নেই। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপন মোতাবেক বাতেলকে কিভাবে পরাজিত করবেন।

দেখুন! পরিষ্কার কথা, আমল আছে কিন্তু এক্বীন নেই। আজ উম্মত আমল শিখেছে কিন্তু এক্বীন শিখেনি। তাই তো তারা আমল থাকা সত্ত্বেও বাতেলের উপর জয়ী হতে পারছে না।

বাতেল কাকে বলে? বাতেল বলে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহামের পর তাঁর যে সব ওয়াদা রয়েছে তাকে কামিয়াবীর এক্বীনি সবব না মনে করে দুনিয়াবী নানান শেকল ও সূরতকে আসবাব হিসেবে মনে করা। বাতেল যখন খোদ আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে তখন আমরা কিভাবে বাতেলের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবো? আজ আহলে হক্ব লোকদেরই হালাল পন্থায় উপার্জনের মাঝে কামিয়াবী নজরে আসছে না। এমনকি মুসলমানরা আপন ঘরে হারাম আসবাব না ঢুকানোকে নাকামী ও বিফলতা জ্ঞান করছে।

তাই তো মেরে দোস্তো! এরাদা করুন, নিয়ত করুন। ইনশাআল্লাহ তা'আলা! আমাদের প্রত্যেককেই দাওয়াতকে উদ্দেশ্য বানিয়ে চলতে হবে। পুরো উম্মতকে এ উদ্দেশ্যের উপর উঠাতে হবে। দাওয়াতের এ মেহনত প্রত্যেক উম্মতের উপর দায়িত্ব। কালিমার মেহনত ছাড়া এক্বীন বনবে না। একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কত মানুষের হেদায়াতের ওসীলা বানিয়েছেন। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক এক সাহাবীকে এক এক গোত্রের হেদায়াতের ওসীলা বানিয়ে দিয়েছেন। এক সাহাবী হযরত দূসী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশিটি ঘরের হেদায়াতের ওসীলা বনেছেন।

এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এই যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন। কারণ, এখন কোনো নবী আসবে না। বরং নবীওয়ালা মেহনতই উম্মতের প্রত্যেক সদস্যকে দান করেছেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাকো এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস করে থাকো।

এখানে "লাম"টি হলো তাখসীস তথা বিশেষকরণার্থে। অর্থাৎ তোমাদেরকে বিশেষভাবে এ কাজের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। এ উম্মত নবীওয়ালা কাজ করার দ্বারাই বিভিন্ন জাতির লোক ইসলামের ছায়াতলে আসবে। কোনো ব্যক্তিই শুধু নয় বরং গোষ্ঠি পর গোষ্ঠি। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের মধ্যে এই যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন।

তাই মেরে দোস্তো বুযুর্গো! পেছনের অতীত হয়ে যাওয়া দিনের জন্য এস্তেগফার করা চাই যে, আমরা এখন পর্যন্ত এ কথা বুঝতে পারিনি যে, আমরাই বিশ্ব মানবতার হেদায়াতের যরী'আ। অনেক বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, তওবা করা প্রয়োজন। আমরা আজ নাগাদ নিজেদেরকে ব্যবসায়ীই মনে করে বসে আছি।

না ভাই! তুমি তো শেষ নবীর উম্মত। তার উম্মত হওয়ার কারণে আমার যিম্মায় নবুয়তওয়ালা কাজও অর্পিত। এ পথে যতই চলতে থাকবো এবং যতই লোকদেরকে দাওয়াত দিতে থাকবো ততই নিজের এক্বীন বনতে থাকবে। উম্মত সহীহ এক্বীন ও আমলের উপর আসতে থাকবে।

এ কারণেই নিজের এক্বীন বানানোর জন্য এবং পুরো পৃথিবীর লোকদেরকে সহীহ এক্বীনের উপর নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে কালিমার দাওয়াত দিতে হবে এবং সমগ্র মুসলিম জাতির মধ্যে তা যিন্দা করার জন্য কালিমার মেহনত করতে হবে। তাই এখন প্রত্যেকে নিজ কুরবানীকে আরও আগে বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করুন। প্রতি বছর চার মাস ও ছয় মাস লাগানোর জন্য নিয়ত করুন। তাই সকলে নগদ নগদ নাম লিখান।

বয়ান-২

মাওলানা সা'আদ কান্ধলভী দা. বা.

স্থানঃ বাঙ্গলাওয়ালী মসজিদ, নয়াদিল্লী, ভারত

তারিখ ঃ ১৪ ই আগস্ট ২০০০ খ্রি.

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! দাওয়াতের সাতাহ (স্তর) এখনও অনেক নিচে নেমে আছে। আমি সত্যিই বলছি, এটা কোনো শেকায়াত বা অভিযোগ নয়।

কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বয়ানগুলো সামনে না আসবে, আমি কসম খেয়ে বলছি যে, খোদার কসম! আমাদের দাওয়াতের স্তর উঁচু হবে না। সকল ওলামায়ে কেরামের কিতাবাদি আপন জায়গায় রয়েছে। কিন্তু হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বয়ানসমূহ আমাদের কাজের স্তরকে আরও আগে বাড়াবে। এছাড়া অন্য কোনো পন্থাই নেই। আপনি চাই আড়াই ঘন্টা চান বা আট ঘন্টা চান অথবা চার মাস বা ছয় মাস চান এসবের দ্বারা কাজ তো তখনই হবে যখন আমরা আমাদের এ কাজের হাক্বিক্বত সম্পর্কে অবগত হবো। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কাজের দ্বারা কী চাইতেন? মেরে দোস্তো বুযুর্গো! ভিত্তিগত কথা হলো, আমাদের পরস্পরের মজলিসে হযরতের বয়ানের কথাগুলো বেশি থেকে বেশি আসা চাই। এটা হলো সর্বপ্রথম কথা। কারণ, এটা এক্বীনি কথা যে, যখন দা'য়ীর দাওয়াতের সাতাহ (স্তর) নিচে নেমে আসে তখন মাদ'উ (যাকে দাওয়াত দেয়া হয়) তার সাতাহ একেবারেই খতম হয়ে যায়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাতে একটি হারানো রত্ন এসেছে। এর অর্থ এটা নয় যে, এখান থেকেই এ কাজ শুরু হয়েছে। বরং কাজ তো খুব পুরানো। এ কাজের সকল প্রমাণাদি ও কার্যপদ্ধতি সবই সাহাবায়ে কেরামের যুগের। যেহেতু এটা নবুওয়ত ওয়ালা কাজ তাই এর দাবি হলো, কাজের সাতাহ (স্তর)

নবীওয়ালা হওয়া। এ কাজ সর্বসাধারণের সাতাহের উপর কখনো আসবে না। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাধারণ লোককে বলেছেন, তোমার নামাজ হয়নি, আবারো নামায পড়ে নাও। কাকে বলেছেন? হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নয়। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নয়। বরং সাধারণ এক লোককে। কারণ, তিনি নবুওয়তওয়ালা নামাযকে একজন সাধারণ লোকের নামাযের সাথে মিলিয়ে দেখাচ্ছেন। যাতে ঐ সাধারণ ব্যক্তির নামাযকে নিজের নামাযের মত করে নেয়া যায়। তাই মিলিয়ে দেখছেন, তার নামায আমার নামাযের মত হচ্ছে কি না। তার নামায তো হচ্ছে কিন্তু আমার সাতাহ অনুযায়ী হচ্ছে না। তাই তিনি তাকে বলে দিলেন, যাও তোমার নামায হয়নি। আবারো নামায পড়ে নাও।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! একটি তো হলো উম্মতের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের দাওয়াতের সাতাহ (স্তর) হতে নিচে নেমে আসা। এ পথ বড় ক্ষতির পথ। অর্থাৎ ঐ কাজ তো কোনো কাজই নয়, যে মাদ'উর (যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার) স্তরে নেমে দাওয়াত দেয়। এটা তো এমন হলো, যেমন দোকানদার ক্রেতার স্তরে নেমে এসে বিক্রয় করলো। তাহলে তো ব্যবসায়ীর ব্যবসাই খতম হয়ে যাবে। কারণ, বিক্রেতা ক্রেতার স্তরে নেমে এসেছে। ঠিক তদ্রূপ যে দা'য়ী তার মাদ'উর স্তরে নেমে এসে দাওয়াত দিবে সে তো দাওয়াতকেই খতম করে দিল।

তাহলে এখন হবে কী? হবে এটা যে, উম্মতের যোগ্যতা লাগবে দুনিয়ার পেছনে। কারণ, আমরা তো লোকদেরকে ঐ সাতাহের দাওয়াত দিচ্ছি না যদ্বারা তারা আপন মেহনতের রোখ পাল্টাতে পারে। দোস্তো! আমাদের কাজের সাতাহ তো অনেক উঁচু।

আমি এ কথা এ জন্য আরয করছি যে, আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় কাজ নিয়ে চলনেওয়ালা। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ভিন্ন বিষয় যে, আমরা আমাদের মজমার সামনে কী কথা পেশ করবো।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঈমানিয়াতের উপর এত বেশি কথা বলতেন যে, মানুষের সামনে তাদের শিরকে খফীগুলোও ধরা পড়ে যেত যে, এটা এটা আমার ভেতরকার শিরকে খফী। তিনি আপন মজমাকে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর উঠাতেন।

আখেরাতের বিভিন্ন ওয়াদার উপর উঠাতেন। তিনি লোকদের সাতাহ হতে উপরের সাতাহের কথা বলতেন। যাতে তাদের সাতাহ আরেকটু উন্নত হয়। আওয়াজ যেমনি হোক না কেন লোকেরা আসল বস্তুর দিকেই মুতাওয়াজ্জুহ হয়ে থাকতেন। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বয়ান শুনে মনে হতো যে, তিনি সাধারণ মানুষকে তার নিজ সাতাহের দিকে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছেন।

মজমার সাতাহ নেমে যাওয়া উচিত নয়। তাহলে তো মজমার লোকেরা এ কাজকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিবে। উম্মতকে যে বস্তুর উপরে উঠাতে হবে, যদি উম্মতকে সে বস্তুর দিকে দাওয়াত না দেয়া হয় তাহলে উম্মতের মধ্যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের যোগ্যতা বরবাদ ও খতম হয়ে যাবে। আমাদের এ কাজের মধ্যে পীড়াপীড়ি নেই, আছে শুধু তারগীব ও উৎসাহ প্রদান। তবে এ উৎসাহ সর্বোচ্চ স্তরের হতে হবে। সে পর্যন্ত আমাদের সকলকে পৌঁছতে হবে। তবে অবকাশ ও ঢিল দেয়া ইত্যাদি নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন—

وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

এ আদেশ দিয়েছেন হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিস্ সালামকে। যারা কাজ নিয়ে চলছিলেন তাদেরকে কত শক্ত কথা বলেছেন—

إِنَّنِي أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

আমি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি ও শুনতে পাচ্ছি।

সাবধান! তোমরা আমার স্মরণে বিন্দু পরিমাণও গাফলত প্রদর্শন করো না।

লক্ষ্য করুন! কাজ নিয়ে চলনেওয়ালাদের উপর কত চাপ। ঢিল দেয়া তাদের ক্ষেত্রে নয়। ঢিল তো অন্যের জন্য।

ঢিল অন্যের জন্য হওয়ার অর্থ হলো, যখন কোনো নতুন তবকা দাঁড়িয়ে কাজের দিকে ধাবিত হতে থাকবে, তখন আপনি তাদের জন্য কাজকে খুব সহজ করে দিন। এরপর যখন তারা কাজের উপর উঠে যাবে তখন আপনি তার সামনে কাজের আসল সাতাহ খুলে দিন। এমন যাতে না হয় যে, আমরা সকলে মিলে কাজের বিশেষ একটি সাতাহ নির্ধারণ করে নিব। আর

তার দিকেই দাওয়াত দিয়ে যাব। এরপর আওয়াম ও খাওয়াস ঐ এক সাতাহ পর্যন্ত এসে থেমে যাবে। না এটা তো হলো ক্ষতির পথ উন্মোচন করা। এভাবে পথ অতিক্রম করলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। আমাদের দাওয়াতের দাবি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজ সাতাহে থেকে উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। আর মাদ‘উ (যাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে) তারা তাদের সাতাহ অনুযায়ী আমল করবে। তাহলে বুঝা গেল যে, কথার স্তর হবে খুব উঁচু আর আমলের স্তর হবে প্রত্যেকের সাধ্য অনুযায়ী। আমলী সাতাহ হবে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে আর তাদের থেকে দাবি করা হবে অনেক উঁচু সাতাহ। যেমন হয়ে থাকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের অবস্থা। ব্যবসায়ী এবং দোকানদারের সাতাহ থাকে অনেক উঁচু আর ক্রেতাদের সাতাহ থাকে অনেক নিচু।

ব্যবসায়ী ক্রেতাদেরকে নিজের স্তর অনুযায়ী খরচ করাতে চায়। এতে ব্যবসায়ীর লাভ হয়। ঠিক তদ্রূপ আমরা প্রথমে একথা ভেবে দেখি যে, আমরা মজমাকে কোন সাতাহের দিকে নিয়ে চলছি। মেরে দোস্তো! একটি অভাব তো হলো, আমাদের মজমার লোকেরা এ কাজকে নবুয়াতওয়ালা কাজ মনে করে চলছে না।

দেখুন ভাই! আমি একথা এ উদ্দেশ্যে আরয করছি যে, আমাদের প্রত্যেক মজলিসেই এ কথাগুলো আসা চাই যে, এ কাজ তো আম্বিয়াওয়ালা কাজ, যা নবীদের থেকে নবীদের পর্যন্ত স্থানান্তর হয়ে চলে এসেছে। এভাবেই হযরত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আর তিনিই এ কাজটিকে উম্মতের হাতে সোপর্দ করেছেন। যাতে উম্মত এ কাজকে নিজের যিম্মাদারী মনে করে চলতে পারে। এমন নয় যে, লোকেরা তো চলছে আমিও চলি।

এই যে আপনারা কুরবানী করছেন তা কেন?

জনসাধারণকে এ কাজের উপর উঠাচ্ছেন তা কেন?

এ কাজে এস্তেকামাতের প্রয়োজন কেন?

জনসাধারণ এ কাজের ব্যাপারে কি ধরনের বাসীরত বাযোগ্যতা অর্জন করবে?

হযরতের যমানাতে এক লোক এ বাঙ্গলাওয়ালী (নিজামুদ্দীন) মসজিদে বয়ান করলেন। যখন তাশকীল করলেন তখন পুরো মজমা দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, আমরা সকলে তৈরি আছি। বয়ান ছিল খুবই জোরদার। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করলে এখানে? তিনি উত্তরে বললেন, হযরত জামাত তো বের করতেই হবে তাই সকলকে জামাতে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি। তারা সকলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে।

হযরত বললেন, ঐ মজমাই তো কাজের উপর টিকে থাকবে যে মজমা কাজকে ঠিকমত বুঝার পর দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় তো দোস্তো! এটা নিরেট অতিক্রমস্থল হয়ে থেকে যাবে। আমি সত্যিই বলছি, আমি যখন কোন কোন প্রদেশের সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, ভাই! আপনাদের প্রদেশে বছরে চার মাস লাগানেওয়ালা সাথী কত জন আছে? তারা উত্তরে বলেন, বছরে চার মাস লাগানেওয়ালা নেই। অথচ যখন জামা‘আতে বের হওয়ার সময় লক্ষ্য করা হয়, তখন দেখা যাবে সাথীর অভাব নেই। অনেক সাথী। মনে হবে এরা হয়তো সকলেই কাজ নিয়ে চলনেওয়ালা। অথচ এদের কেউই কাজ নিয়ে চলনেওয়ালা নয়। কোথায় গেল এত সংখ্যক লোক ও এতগুলো সাথী? কারণ, যারা নাম লিখিয়ে জামা‘আতে বের হচ্ছে তাদের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘরের তালীমের, মসজিদের তালীমের, মাশওয়ারার ও মসজিদওয়ারী পাঁচ কাজের সাথে হিসাব নিয়ে দেখি এত বড় মজমা কোথায় চলে গেল? তো ভাই! একটি তো হলো, মজমাকে নবুয়াতওয়ালী কাজের উপর দাঁড় করানো। আরেকটি হলো, শুধু নাম লিখিয়ে জামা‘আতে বের করে দেওয়া। শুধু নাম লিখিয়ে জামা‘আতে বের হচ্ছে তাদের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘরের তালীমের, মসজিদের তালীমের, মাশওয়ারার ও মসজিদওয়ারী পাঁচ কাজের সাথে হিসাব নিয়ে দেখি এতবড় মজমা কোথায় চলে গেল? তো ভাই! একটি তো হলো, মজমাকে নবুয়াতওয়ালী কাজের উপর দাঁড় করানো। আরেকটি হলো, শুধু নাম লিখিয়ে জামা‘আতে বের করে দেওয়া। শুধু নাম লিখিয়ে জামা‘আতে বের করে দেয়াই আমাদের কাজ নয়। বরং এদিকে খুব ভাল করে খেয়াল রাখা যে, মজমা কোন বুনিয়াদের উপর দাঁড়াচ্ছে? কেন সাথীরা তাবলীগে বের হচ্ছে? কেন নাম লেখাচ্ছে? কী উদ্দেশ্য তাদের?

আমি তো নিজেও লোকদের বয়ান শুনছি। শুনে তো মনে হয় যে, আমরা মজমার লোককে দুনিয়াবী সমস্যা ও নানা ধরনের পেরেশানী হতে বের করে আনার জন্য তাশকীল করছি ও তাবলীগে বের করছি।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে তো বিধর্মীদেরকে ইসলামে আনা হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্বীয় সাহাবীদেরকে আখেরাতের ওয়াদার উপর দাঁড় করাতেন। আর অমুসলিমদেরকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে ইসলামের দিকে ধাবিত করতেন।

এ কারণেই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বয়ানগুলো আমাদের মাথায় রাখা চাই। আপনারা সকলেই এর চেষ্টা করুন, যাতে আমাদের কথা আমাদের সাতাহ থেকে নিচে নেমে না আসে। আমাদের কথা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হতে বের হয়ে না যায়। এ সময়ে এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। দেখুন ভাই! কুরবানীর সাতাহ তো আমাদের কথার সাতাহ থেকে কায়েম হবে। মেরে দোস্তো আওয়ামের মধ্যে এবং খাওয়াসের মধ্যে যে সাতাহ পয়দা হবে তা তো আমাদের কথার দ্বারাই পয়দা হবে। তারা তো বলবে, যে সাতাহের বয়ান হচ্ছে আমাদের ঐ কথার উপর উঠতে হবে। কিন্তু যদি আমরাই কাজকে সহজ বানিয়ে ফেলি ও ঢিল দেয়া শুরু করি তাহলে তো লোকেরা আপনার নিকট এ নিবেদন পেশ করতে শুরু করবে যে, ভাই! আমাকে অনুমতি দিন, আমি সকালে এক ঘন্টা লাগাবো আর বিকালে দেড় ঘন্টা লাগাবো। এমনকি আমরা এ ভাবনায় পড়ে যাবো যে, মসজিদের এই তরতীব আসলো কিভাবে যে, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কাজ পুরা করে মসজিদে সময় দিচ্ছে। দেখুন ভাই! আমাদের সকলকে আট আট ঘন্টার দাওয়াত লোকদেরকে জমে দেয়া চাই। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, বছরের চিল্লা, মাসের তিন দিন, সাপ্তার দুই গাশ্‌ত ও দুই তালীম এগুলো তো হলো নিজ জাতের মধ্যে ফিট করার জন্য। এখন পর্যন্ত কাজ করনেওয়ালা সাথীরাই এখানে এসে আটকে আছে। যিনি পুরো আলমের কাজের যিম্মাদারী নিয়ে আছেন বলে ঘোষণা করছেন তিনিই আটকে আছেন। অথচ ইনি তো হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি অন্যের থেকে সময় চাচ্ছেন ও অন্যকে কাজের উপর দাঁড় করাচ্ছেন। তাহলে কাজকে আগে বাড়ানোর ধরন কী হবে? কি পন্থা হবে? দেখুন ভাই! এর সবচেয়ে উত্তম ধরন হলো, দাওয়াত

দেনেওয়ালা তো নিজের সাতাহে টিকে থেকে অন্যকে দাওয়াত দিবে। আর মাদ‘উ (যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে) তিনি যতটুকুই পেশ করছে তাকে কবুল করে নিবে। এটাই হলো, এ কাজে মেযাজে নবুয়ত। যেমনটি করা হয়েছিল শফীক গোত্রের লোকদের সাথে। আর আমাদের বিষয় পুরো উল্টে গেছে। উসূল তো চালাচ্ছি নতুন নতুন লোকদের উপর, আর আমরা করছি বে-উসূলী।

তাই মেরে দোস্তো! স্মরণ রাখবেন,মুলকের তাকাযা তো সেই পুরা করতে পারবে, যে নিজের দাওয়াতের সাতাহ ও কুরবানীর সাতাহ উঁচু করবে। আমরা আসানীর দাওয়াত কখনো দিব না। এ আসানীর দাওয়াত কাজের স্তরকে একেবারেই নিচে নামিয়ে দিয়েছে। তাই আপনি দাওয়াত দিন পুরা, পুরা তাহলে লোকেরা আসানীর দরখাস্ত নিয়ে আসবে। আপনি তাকে এজাযত (অনুমতি) দিয়ে দিন। যেমনটি হয়েছিল শফীক গোত্রের ক্ষেত্রে। তো ভাই! দাওয়াত ও এজাযত এ দু'য়ের মাঝে অনেক তফাত রয়েছে। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতকে পুরা করেছেন। পরিপূর্ণ দাওয়াত দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, এ দাওয়াতের কাজ হলো আমরে জামে। কাকে বলা হয় আমরে জামে? আমরে জামে বলা হয়, যেমন জুমুআর নামায বা যে কোনো জামা‘আতের নামাযকে। অর্থাৎ জামাতের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে যে কাজ করা হয় তাকেই আমরে জামে বলা হয়। সুতরাং দাওয়াতের কাজ আমরে জামে হওয়ার কারণ হলো,

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক আমলা ছিলেন। যিনি রাত-দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একেবারে লেগে থাকতেন। কখনো দূরে যেতেন না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জমে থাকতেন। আমলারা যখন আমীরের সাথে জমে থাকে তখনই তাকাযাসমূহ পুরা করা সহজ হয়ে যায়। এখন যদি তারা এজাযত নিয়ে নিয়ে চলে যেতে শুরু করে, তাহলে জেনে রাখুন এজাযতের কাজ খুব দুর্বল হয়ে থাকে। ঈমান ওয়ালারা যখন আমরে জামেয়ের সাথে থাকবে তখন তারা এজাযত ছাড়া যেতে পারবে না। যদি কেউ এজাযত নিয়ে চলে যায় তার জন্য সকলে মিলে এস্তেগফার করবে। এস্তেগফার তো করা হয় গুনাহের কারণে, এখানে আবার কী গুনাহ হলো?

সে তো এজাযত নিয়ে গিয়েছে। সকলকে এস্তেগফার করতে হবে কেন? এটা এ কারণে যে, কাজটি আমরে জামে, তাই। আমরে জামেয়ের ক্ষেত্রে এজাযত নিয়ে গেলেও সকলকে এস্তেগফার করতে হয়। কারণ, আমরে জামে তথা সমষ্টিগত কাজে একজনের অনুপস্থিতিও অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু লোকটি আমরে জামে রেখে চলে গিয়েছে তাই এস্তে গফার করা প্রয়োজন। ভাই! এ কথাটি যখন ওলামায়ে কেরামগণ শুনে ফেলবেন তখন তারা বলা শুরু করবেন যে, দেখো! কিতালের (জিহাদের) বিষয় এনে এখানে জুড়ে দিচ্ছে।

সত্য কথা তো হলো, কিতাল (জিহাদ) নবুওয়াতের লক্ষ্যবস্তু নয়। যদি কিতাল নবুওয়তের লক্ষ্যবস্তু হতো (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে এর অর্থ তো এমন হতো যে, যাদের নিকট নবী পাঠানো হয়ে থাকে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য নবী প্রেরণ করা হয়। এ যামানায় তো শুধু আমাল ও কিতালই রয়ে গিয়েছে। মধ্যখান থেকে দাওয়াত বিদায় নিয়ে গেছে। এখানে আমরে জামে কিতাল নয়। বরং আমরে জামে হলো ঐ জামা'আত যা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দ্বীন শিখবার শিখাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। পথিমধ্যে কোথাও কিতাল (জিহাদ) করার প্রয়োজন দেখা দিলে অবশ্যই জিহাদ করবেন। তবে তা হবে জিযিয়া-করের ধাপ পার হওয়ারও পরে। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও বুখারী শরীফের জিহাদ অধ্যায়ে ঐ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, যে যুদ্ধে জামা'আত কাজ করে চলে এসেছেন কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ করা ছাড়াই। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ গজওয়াগুলোকেও জিহাদ অধ্যায়েই উল্লেখ করেছেন।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, (আপনারা নিজেরাও ঐ চিঠিটি পড়ে নিতে পারেন– যা হযরতের জীবনিতে ছাপানো হয়েছে– তাতে লিখা রয়েছে) "উম্মত এ কাজকে এ জন্য এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে না যে, তারা এ কাজটিকে নিরেট কালিমা, নামায সহীহ করার একটি আন্দোলন মনে করে বসে আছে। অথচ এ কাজের উদ্দেশ্য হলো দাওয়াতের মাধ্যমে নিজ নিজ কালিমা, নামাজের এক্বীন এবং কালিমা, নামাযের নূর ও রূহ পয়দা করা।"

এ কথাটি হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনীতে ছাপা হয়েছে যে, আমরে জামে (সমষ্টিগত কাজ) এর অর্থ হলো এক উম্মত এমন হবে যারা লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার তা'আরুফ (পরিচয়) করাবে। আল্লাহ তা'আলা আমলের উপর যেসব ওয়াদা করেছেন সে দিকে তারা দাওয়াত দিবে। আর এরাই হবে কামিয়াব।

জি এটাই হলো আমরে জামে। আমরে জামে থেকে বিনা এজাযতে যাওয়া তো দূরের কথা এজাযত নিয়ে যাওয়াও অন্যায়। তাইতো এখানে এস্তেগফার করতে হবে। আল্লাহ তা'লা সামনে কী বলছেন? আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার জাতের উপর এক্বীন করেছে তারা এজাযত নিয়েও যাবে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার জাতের উপর ও তার ওয়াদাসমূহের উপর এক্বীন করেননি তারাই তো এজাযত নিয়ে নিয়ে ভাগতে থাকবে।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ ঘরের বিয়ে-শাদী ও জানাযার ব্যস্ততাকে ছেড়ে না আসতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা উম্মতকে এ কাজে নিয়ে আসতে পারবে না। যে কুরবানী দিবে সেই কুরবানীর কথা বুঝতে পারবে। সহুলত ওয়ালারা (সুবিধাবাজ লোকেরা) কুরবানীর কথা বুঝতে পারবে না। সহুলত ওয়ালারা তো এশকাল ও প্রশ্ন করে বেড়াবে। সুবিধাবাদী লোকেরা কুরবানীর কথাকে ইশতি'আল মনে করে থাকে। ইশতি'আল অর্থ হলো বিশৃংখলা। আমি সত্যই আরয করছি। আপনাদের থেকে শুনেই বলছি। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ইশতি'আল ও তারগীবের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইশতি'আল হয় ফ্যাসাদের উদ্দেশ্যে, আর তারগীব হয়ে থাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে।

আমি এখানে এক সাথীকে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বয়ান শুনালাম। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, এ বয়ান তো কাউকে শুনানো উচিত নয়। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, এতে তো আজব কথা রয়েছে। আমি বললাম, আজব কথা রয়েছে বলেই তো শুনাচ্ছি। এরপরও যখন লক্ষ্য করি তখন দেখি যে, আমাদের বয়ানগুলোর মধ্যে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা পাওয়া যাচ্ছে

না। প্রত্যেকে আপন আপন কথা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার তো অবাক লাগে যে, লোকেরা আজ কিতাব মুতালা'আহ করে করে বয়ান করছে। এমনকি পেপার-পত্রিকার কথাও আমাদের সাথীদের বয়ানে চলে আসছে। দিন দিন আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু থেকে সরে যাচ্ছি।

মেরে দোস্তো বুযুর্গো! এ কাজ কোনো ওযীফা নয়। আরও আগে বেড়ে এ কাজ কোনো আমলও নয়। এ কাজ কোনো সওয়াবের জন্য করা হয় না। এগুলো মাকসূদ নয় বরং মাউ'ঊদ। মাকসূদ তো হলো, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সেই সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই এ মেহনত। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমাদেরকে এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার নিয়ত করাও অনুচিত। বরং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার এক্বীন করা চাই। কারণ, কোনো কাজে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার এক্বীন করনেওয়ালারা এহতেসাবের উপর টিকে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পাওয়ার নিয়ত করনেওয়ালারা হয় স্বার্থান্বেষী। আর এহতেসাব প্রত্যেক আমলের মধ্যেই আবশ্যকীয়।

আপনারা তো ঐ সকল লোক, যারা আপন আপন এলাকায় কাজ নিয়ে চলনেওয়ালা। আমার দরখাস্ত হলো, আপনারা আপনাদের বয়ানের সাতাহকে আরও উঁচু করেন। যেখানে উঁচু মানের ঈমান ও উঁচু পর্যায়ের কুরবানীর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

তোমরা ঈমান আনো সাহাবাদের ঈমানের মত।

এটা কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ঘোষণা। কেয়ামত নাগাদ আগত মানব জাতির জন্য এই ঘোষণা। সাহাবাদের ঈমানই কাম্য ও প্রত্যাশিত বিষয়। আমরা মজমার দিকে তাকিয়ে কথা না বলি। আমরা তো আমাদের হিসেবেই কথা বলবো। আর অন্তর তো আল্লাহ তা'আলার হাতে।

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আপনি লোকদেরকে সঠিক সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

তবে...

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

আপনি যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকেই হেদায়াত দিতে পারবেন না।

তো ভাই! আমরা আমাদের দাওয়াতের সাতাহ কে উঁচু করে ফেলি। উঁচু ঈমান ও উঁচু কুরবানীর দিকে দাওয়াত দিয়ে যান। যাতে আমাদের কাজ আগে বাড়তে থাকে। চাই তা মসজিদের কাজ হোক বা প্রাদেশিক কাজ হোক অথবা মুলকের কাজ হোক। যত আ'লা (উঁচু) দাওয়াত হবে ততই যোগ্যতার সঠিক প্রয়োগ হতে থাকবে।

ছয় নাম্বার হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির "আল-ফুরকান"-এ ছেপেছে। আপনারা সকলে দেখে নিবেন। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে দ্বীন শিখানো অপেক্ষা দ্বীনের মেহনত শিখানোর পেছনে বেশি মেহনত করতেন। দাওয়াত দ্বীনের অস্তিত্ব টিকে থাকার কারণ। দাওয়াত এক্বীন ও পরিবেশ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কথা যখন একটু উঁচু সাতাহের হবে তখন তো মজমার লোকেরা একটু নড়াচড়া করবেই। কিন্তু লক্ষ্য করুন, মেধাগত স্তর সকলের বরাবর নয়। আমাদের কথা হবে অনেক উঁচু সাতাহের। শ্রোতারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ মেধাগত স্তরের ভিত্তিতে কথা নিবে। আপনি হাজার মানুষের মাঝে কথা বলবেন, কথা নিবে একশ জন। আপনি আপনার কথার উপর পাবেন একশজনকে। হ্যাঁ! সকল দানাই উদগত হয় না। চাষী যতগুলো বীজ ফেলে তার সবগুলোতেই কি চারা হয়? না। তাই আপনি তো আপনার উঁচু সাতাহের কথা বলে যাবেন। এই এক হাজারের মধ্য হতে যারা কুরবানীর উপর উঠবে তারাই অন্যদের কাজে লাগার যরী'আহ ও মাধ্যম হবে। তাই ভাই! আমাদের মসজিদে কাজ যতটুকু হচ্ছে তার থেকে মেহনতকে আরও আগে বাড়াতে হবে। আর সে জন্য আট আট ঘন্টা লোকদেরকে খুব জমে দাওয়াত দিন। হ্যাঁ! এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, কমপক্ষে আড়াই ঘন্টা দিতে হবে। এখন যদি কেউ পাঁচ মিনিটও দেয় আমরা ততটুকুই কবুল করে নিব। ভাই! দেখুন, মসজিদওয়ার জামাত বানানোর যতই মোযাকারা করা হোক না কেন, এখতেলাফ যতই

করুন না কেন, কুরবানীর সাতাহ বাড়ানো ছাড়া এসব কথা আমলে আসবে না। আর দাওয়াতের সাতাহ বাড়ানো ছাড়া কুরবানী ওজূদে (অস্তিত্বে) আসবে না।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে কথা কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো মজমাকে বলতেন, তাদেরকে তিনি বলতেন, আমি তোমাদেরকে যেভাবে দাওয়াত দিচ্ছি তোমরাও এভাবে দাওয়াত দিবে। মেরে দোস্তো! একটি তো হলো, আপনাদের সাথে আমার কথা বলা আরেকটি হলো, এ কথাগুলোকেই আমলের মাধ্যমে বলা। এরপর আপনার ঐ আমলা যাকে আপনি দাওয়াত দিবেন তাকেও এ কথা বলুন। তাহলেই তো কাজ আগে বাড়বে। অর্থাৎ আমাদেরকে দেখতে হবে যে, আমরা উম্মতকে আমলের উপর উঠাচ্ছি, না দাওয়াতের উপর উঠাচ্ছি? আমি তো এ কথা মনে করি যে, আমরা আমাদের সকল মেহনত ও দৌড়-ঝাঁপ ব্যয় করছি উম্মতকে আমলের উপর উঠানোর জন্য। না ভাই! উম্মতকে দাওয়াতের উপর নিয়ে আসুন। নিজে নিজেই আমলের উপর উঠে যাবে। যাকে আমলের উপর উঠানো হবে সে দাওয়াতের উপর উঠবে না। পক্ষান্তরে যাকে দাওয়াতের উপর উঠানো হবে তার মধ্যে আমল এমনিতেই চলে আসবে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন উম্মত হতে দাওয়াত বিদায় নিয়েছে তখন থেকে তাদের থেকে দ্বীনও বিদায় নিয়ে গেল। নবী এসেছেন দাওয়াত এসেছে, দ্বীন এসেছে। নবী চলে গিয়েছেন দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে ও দ্বীনও বিদায় নিয়েছে। আমি সব কিছুই দেখছি ও শুনছি। সবার কথা ও কাজ চলছে শুধুমাত্র আমলের জন্য। আমি এখানেই হায়দারাবাদের সাথীদেরকে বলেছি, ভাই! আল্লাহ তা'আলার পথে বের হয়ে এক নামাযের বিনিময়ে ষাট লক্ষ গুণ ও উনপঞ্চাশ কোটি গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। আমাদের এ মজমাও এ কথা মনে করে বসে আছে যে,– আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাফ করুন– এমনকি আমাদের এ পুরানো মজমাও মনে করছে যে, তাদের সামনে আমলের ফাজায়েল বলা হচ্ছে। অথচ ভাই! মূলত আমলের ফাযায়েল বলা হচ্ছে না, বরং একথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হওয়ার ফযিলত বলা হচ্ছে। আপনারা মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বয়ানসমূহ দেখুন। তা

পড়ে দেখা চাই। যাতে আমাদের বয়ানের সাতাহ উঁচু হতে থাকে। উঁচু উঁচু আযায়েমের উপর দাঁড় করান।

এখন তো আপনাদের সামনে এ কথাই বলবো যে, কুরবানীকে বাড়িয়ে দিন। তাহলেই সব কিছু বনে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু মেরে দোস্তো! যেসব কষ্ট-ক্লেশ আসবে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য বরদাশ্‌ত করে নিন। নিজেকে এ কাজের যিম্মাদার মনে করে সামনে অগ্রসর হোন। যে নিজেকে যিম্মাদার বানিয়ে নিজেকে পেশ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর পরিমাণে দান করবেন। মেরে দোস্তো! যে ব্যক্তি কুরবানী বাড়িয়ে দিবে সে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত হবে। আর যে কুরবানীর দিক দিয়ে পিছিয়ে যাবে সে কাজ হতে পিছে সরে যাবে। যে কুরবানীর দিক দিয়ে অগ্রসর হবে সে কাছে আসতে থাকবে আর যে কুরবানী পিছিয়ে দিবে তাকে পেছনেই ফেলে রাখা হবে। সেই সাথে তার সামনে এমন এমন সমস্যা চলে আসবে যে, ঐ সমস্যাই তাকে পেছন দিকে টানতে থাকবে। ফলে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। এমন অবস্থা হতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। হযরত ফরমান, কুরবানীর পথে নানা ধরনের সমস্যা ও দুরাবস্থা বাধা দিতে থাকবে। যে ব্যক্তি এসকল সমস্যা ইত্যাদির মধ্য দিয়েও সামনে অগ্রসর হতে থাকবে আল্লাহ তাকে নৈকট্য প্রদান করবেন। তাকে বিশেষ বখশিশ দিতে থাকবেন। তাই এ রাস্তার কষ্ট-ক্লেশকে বরদাশত করতে থাকুন। কুরবানীর সাতাহকে বাড়াতে থাকুন। কুরবানীর সাতাহকে বাড়ানো কাকে বলে? কুরবানীর সাতাহকে বাড়ানো বলা হয় একে যে, আপনি ভেবে দেখুন, আপনি কাজের কোন স্তরে আছেন। আপনি কোন স্তরে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। এরপর ঐ স্তর থেকে উপরের স্তরে উঠার চেষ্টা করুন। যার নযর নিজ দোষ-ত্রুটির উপর পড়বে, সেই কুরবানীতে আগে বাড়তে পারবে। এটাই হলো এ কাজের উসূল। আর যার নযর নিজ কুরবানীর উপর পড়বে তা দ্বারা অন্তরে ফখর ও গর্ব জন্মিবে। অতঃপর এ গর্ব অহংকার জন্মাবে। এরপর সে এ কাজের মধ্যে নিজের মাকাম তালাশ করতে থাকবে। তাই কখনো নিজ কুরবানীর উপর নযর দিবেন না। বরং সবসময় নিজ দোষ-ত্রুটির উপর নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। এতেকরে এসলাহও হতে থাকবে এবং উন্নতিও হতে থাকবে। তরবীয়তও হবে তারাক্কীও (উন্নতি) হতে

থাকবে। আর কুরবানীর উপর দৃষ্টি রাখার দ্বারা অহংকার পয়দা হতে থাকবে।

ঐ ব্যক্তির তারগীব অধিক ক্রিয়াশীল হবে, যে এ পথে অধিক কষ্ট-ক্লেশ বরদাশ্‌ত করতে থাকবে। কাম করনেওয়ালাদের কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদ বরদাশ্‌ত করা তাদের তারগীবকে ক্রিয়াশীল বানাবে। আজ তো ব্যাপার হয়ে গেছে এর উল্টা। নিজেরা আরাম খুঁজি আর কষ্ট সঁপে দেই আরেক জনের উপর। এভাবে তো আমাদের কথাতে কোনো তাসীর (প্রভাব-প্রতিক্রিয়া) বাকি থাকবে না।

মেরে দোস্তো! আমাদের কুরবানীকে এখন খুব বাড়াতে হবে। দেখুন ভাই! বাচ্চাদেরকে দু'বার পিটানো হয়। যদি সে স্কুলে যেতে দেরি করে তাহলে একবার ঘরে পিটা খায়, আরেকবার পিটা খায় স্কুলে গিয়ে। স্কুলে যাওয়ার পর টিচার পিটুনি দিবেন, দেরিতে আসলে কেন? আর ঘরে পিটাবে আব্বাজান, দেরি হয়ে গেল তবুও স্কুলে যাসনি কেন? তো মেরে দোস্তো! একটি কুরবানী হলো এ কাজের মধ্যে আসবার জন্য, আরেক কুরবানী হলো, ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য। এখন তো তাকাযা হলো, মুলকের তথা বিদেশের। তাই ভাই! লম্বা লম্বা নিয়ত করুন। এই যে বছরের চিল্লা, মাসের তিন দিন, সপ্তাহের দুই গাশ্‌ত ও রোজানা কমপক্ষে আড়াই ঘন্টার ফিকির হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ভাই! এগুলো তো হলো নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য। কথাগুলো আলফুরকানে ছাপানো আছে। দেখে নিবেন।

আমার তো আজ মনে চাচ্ছে যে, আপনাদেরকে হযরত ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ছয় নম্বর শুনাই। যা আল-ফুরকানে ছাপা হয়েছে। আপনাদের নিকট দরখাস্ত হলো, আল-ফুরকানে হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর যেই হেদায়াত ছাপানো হয়েছে তা আপনারা বারংবার পাঠ করবেন। আমি পরিষ্কার বলছি যে, এতে আপনি পাবেন যে, হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি গাশতের শিরোনাম নামায দিয়ে রাখেননি। বরং গাশতের শিরোনাম ধার্য করেছেন দাওয়াত দিয়ে। এরপর এবাদতকেও গাশতের শিরোনাম ধার্য্য করেননি। আপনি সেখানে সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, তিনি গাশতের শিরোনাম ধার্য

করেছেন দাওয়াত দিয়ে। এমনকি তিনি এটাও বলেছেন যে, তোমরা দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি প্রয়োজন মনে করো তাহলে নামাযকে বাহানা স্বরূপ ব্যবহার করো। কারণ, মুসলমান নামাযকে অস্বীকার করবে না। এসব কথা আল ফুরকানে লেখা আছে।

এটা আপনাদের প্রত্যেকের নিকট থাকা চাই। এতে অনেক হেদায়াত রয়েছে। খুব স্পষ্ট ভাষায় লিখা রয়েছে। বিভিন্ন জামা'আতের নামে হেদায়েতী চিঠিও রয়েছে তাতে। সেখানকার হেদায়াতগুলো দেখে নিলে কাজ করা আসান হয়ে যাবে। আর যদি প্রশ্ন করে করে বেড়াও তাহলে জেনে রাখো, প্রশ্নের দ্বীন খুব কঠিন হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলতেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখতেন। প্রশ্ন ও এশকাল ইত্যাদি কাজকে খুব কঠিন বানিয়ে দেয়। মসজিদওয়ার জামা'আতের মোযাকারা খুব সহজ। কিন্তু এটা সহজ তখনই যখন তার জন্য সময় বের করা হবে। এখন দাওয়াতের যিম্মাদারী আপনি নিয়ে নিন এবং কুরবানী বাড়িয়ে দিন। প্রত্যেক বছর চার চার মাসের জন্য নিয়ত করুন।

বয়ান-৩

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ۔

মেরে দোস্তো বুযুর্গো!

আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় ও করমে আমাদেরকে এক বড় ও উঁচু আমানতের বাহক বানিয়েছেন এবং এটা নির্বাচন নয় বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা। আমরা যেন এটাকে নির্বাচন মনে না করি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই আমানতের জন্য নির্বাচন করেছেন। বরং আমাদের জন্য এটা পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাকেই নির্বাচন করা হবে।

এমন না যে, কাজ করনেওয়ালা নির্বাচিত। বরং যে কাজ করছে সে তো পরীক্ষার সম্মুখীন আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষার পর নির্বাচন করবেন যে, সে কাজের যোগ্য কি না? এ পরীক্ষায় অনেকে ফেল হয়ে যায়। সুতরাং এ যিম্মাদারীর বাহক বা উঠানেওয়ালার সব সময় আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে কবূল করানোর ফিকিরে এবং কবুলিয়াতের শর্ত পূরণের ফিকিরে মশগুল থাকা চাই। এজন্য খুব চিন্তা-ফিকির করি, আল্লাহর কাছে এ কাজের কবূলিয়াতের জন্য কি কি আসবাব রয়েছে? এবং আল্লাহর কাছে কি কি আসবাব আছে এ কাজ হতে সরে যাওয়ার? অর্থাৎ এমন আসবাব যার দ্বারা ভালো ও পুরানো কাজ করনেওয়ালারাও বিতাড়িত হয়ে যায়? এটা বলা যায় না যে, অমুক ব্যক্তি বেশি কবূল হয়ে গিয়েছে এবং বেশি আগে বেড়ে গেছে।

মেরে দোস্ত বুযুর্গো! ওহীর কাতেব বা লেখক, যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ওহীর নুযূল দেখতেন। অপেক্ষা করতেন কখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হবে আর সাথে সাথে তা লিখবেন। কুরআন নাযিল হতে দেখেছেন। এমন কাতেবে ওহীও যদি পরীক্ষায় ফেল হতে পারে তবে এর চেয়ে ওপরে আর ভালো মর্তবা তো হতে পারে না, এক্বীন করার জন্য যে ওহী নাযিল হতে

দেখেছেন। একবার ওহী নাযিল হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাতিবে ওহীকে বললেন, লেখ। ওদিকে আল্লাহ পাক এক মজমূন বা বিষয় ওহীর ন্যায় ঐ কাতিবে ওহীর দিলে ঢেলে দিলেন। ঐ কাতিবে ওহী বললেন–

ফাতাবারকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন।

আল্লাহ তা'আলা কত সুন্দর সৃষ্টিকারী।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঐ কাতিবে ওহীকে) বললেন এটাও লেখ। কারণ, এটা তার অন্তরে এসেছে ওদিকে এটা ওহী হিসেবেও এসেছে। এত বড় নৈকট্য আর মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে বের হওয়ার ঘটনা রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করে ফেল। যদি তাকে বাইতুল্লাহর পর্দা ধরা অবস্থাতেও পাও তবুও তাকে কতল করে দাও। অথচ সে ছিল কাতিবে ওহী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছে।

বলার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যোগ্যতা কবুলিয়াতের কোনো বুনিয়াদ নয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমল হলো কবুলিয়াত তার জন্য চাই সিফত বা গুণাবলী। এজন্য নিজেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে কবুল করানোর জন্য শর্তাবলির উপর চিন্তা করো। মনযোগ দাও যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে কবুলিয়াতের শর্ত কি কি?

প্রথম শর্ত হলো, এ রাস্তায় অপছন্দনীয় হালাতের উপর ধৈর্য ধারণ করা, এটা সকল নবীদের গুণ। নবীদের ইজতেমায়ী সিফাত। কেননা, এ রাস্তার অপছন্দ অবস্থার উপর সবর করা তরবিয়তের সবব বা মাধ্যম। কতক্ষণ সবর করব? একটা প্রশ্ন আসে প্রত্যেক সাথীর দিলে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ হতে বের হচ্ছিলেন। আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে শুয়ে ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন। তিনি উঠলেন। হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, মসজিদে কেন শুয়ে আছ?

তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কোনো ঘর নেই। তাই আমি মসজিদে এসে ঘুমাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন (তুমি আমাকে এটা বলো) আমার পর মদীনার উমারা বা জিম্মাদাররা যদি তোমাকে বিরক্ত করে বা কষ্ট দেয় তুমি তখন কী করবে?

আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি শাম দেশে চলে যাব এবং সেখানে ঘর বানিয়ে থাকব। কেননা, শাম দেশ নবীদের এলাকা।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মূলকে শামের উমারা বা জিম্মাদাররাও যখন তোমাকে বিরক্ত করবে বা কষ্ট দিবে তখন তুমি কী করবে?

বারবার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে চাচ্ছিলেন, আমার সাহাবাদের মধ্যে সবরের যোগ্যতা কতটুকু? কতক্ষণ সবরের জন্য তারা তৈরি আছে?

আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আবার মদীনায় ফিরে আসব এবং এখানে ঘর বানিয়ে থেকে যাব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মদীনার জিম্মাদাররা যদি তোমাকে পুনরায় কষ্ট দেয় ও বিরক্ত করে তাহলে তুমি কী করবে?

আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহলে আমি তাদের মোকাবেলা করব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু যর! ক্ষমা করতে থেকো যে পর্যন্ত কেয়ামতে আমার সাথে সাক্ষাৎ না করবে।

মেরে মোহতারাম দোস্ত!

তরবিয়ত ও তারাক্কীর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো এ রাস্তায় সবর করা। যার অন্তরে প্রতিশোধের জযবা থাকবে সে নবীওয়ালা রাস্তায় চলতে পারবে না। কেননা প্রতিশোধের জযবা ও উম্মতের তরবীয়তের জযবা এক অন্তরে জমা হতে পারে না। এই দুই জযবা এক দিলে কখনও জমা হতেই পারে না। কেননা যারা উম্মতের তরবিয়ত, হেদায়াত ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক চাইবেন তারা এ চাহিদার কারণে সব কষ্টকে বরদাশ্ত করবেন ও সহ্য করবেন। এ জন্যই প্রতিশোধ আর হেদায়েতের জযবা এক দিলে জমা হতে

পারে না। যদি কারো দিলে প্রতিশোধের জযবা পয়দা হয় তাহলে বুঝে নাও যে, সে এ কাজের জযবা থেকে দূরে সরে গেছে এবং এ কাজের জযবা থেকে তার দিল খালি হয়ে গেছে। যদি কখনও কোনো নবীর দিলে মানবিক কারণে প্রতিশোধের খেয়ালও এসেছে সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাম্বীহ বা সতর্ক করা হয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি কসম খেয়ে বলছি, হামযা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হত্যার মোকাবিলায় আমি ৭০জন কাফেরকে কতল করব। তেমনি কতল করব। যেমন হামজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে করা হয়েছে, যেভাবে মুসলা করা (হাত পা কাটা) হয়েছে। আমি ৭০ জন কাফেরকে সেভাবে মুসলা করব।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এর উপর তাম্বীহ করা হলো, হে নবীজী! আপনি এটা কী করলেন?

যদি আপনার বদলা একান্তই নিতেই হয় কাফেরদের থেকে (আমি কাফেরদের কথা বলছি) নিজেদের মধ্যে বদলা নেয়ার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। যদি কাফেদের থেকে বদলা নিতেই হয় তাহলে এতটুকুই করতে পারেন যতটুকু আপনার সাথে করা হয়েছে। আপনি এক হামযার প্রতিশোধে ১জন কাফেরকে কতল করতে পারেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কসমের কাফ্ফারা দিলেন এবং কসমও ভাঙলেন।

ভাই! বুনিয়াদি কথা হলো, প্রতিশোধের সাথে এ কাজের কোনো জোড় মিল নেই। কেননা সবর আর ইন্তেকাম একত্র হতে পারে না। উম্মতের হেদায়েতের স্পৃহা আর প্রতিশোধ এক দিলে জমা হতে পারে না। এ জন্য সব নবী ও সাহাবাদের ইজতেমায়ী সিফত ছিল সবর ও ধৈর্য।

সবর আলামাতে নবুয়ত তথা নবুয়তের নিদশনসমূহের একটি। আলামত সিফত হতে উঁচু বা উপরের স্তরের। হযরত যায়েদ ইবনে সানা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে এই নিদর্শন তালাশ করলেন যে, তার মধ্যে সবর কতটুকু আছে? তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঋণ দিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিলেন। যার বিনিময়ে খেজুর পরিশোধ করবেন বলে কথা দিলেন। সময় আসার ৩দিন আগেই যায়েদ ইবনে সানা

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামার গিরীবান (কলার) চেপে ধরলেন এবং অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার করলেন। ঘটনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর অবস্থা এর পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রকাশ পেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করলেই তাকে কতল করে দিবেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর! তুমি এটা কি করলে? তোমার উচিত ছিল আমাকে বলতে ঋণ পরিশোধ করতে, আর তাকে বলতে যেন সে তার পাওনা উত্তম পন্থায় চায়। তুমি তাকে হত্যার ধমক কেন দিলে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর! যাও, তাকে তার পাওনা দিয়ে দাও এবং তাকে তার পাওনার চেয়ে ২০ সা খেজুর অতিরিক্ত দিয়ে দাও। এটা আমাদের জন্য শিক্ষা যে, বাড়াবাড়ি করনেওয়ালার সাথে অনুগ্রহ করবে। আমাদের এখানে মুকাফাত বা বদলা নেয়া নেই বরং আছে এহসান।

কার উপর এহসান? এহসান করনেওয়ালার উপর? শুনুন! ধ্যান দিয়ে শুনুন! এহসান করনেওয়ালার উপর এহসান তো এহসানের বদলা স্বরূপ। তার চেয়ে বেহায়া আরকে হবে যে এহসানেরও বদলা না দেয়? সে তো অত্যন্ত খারাপ মানুষ, যে এহসানের বদলা দেয় না। আমাদের স্তর এই নয় যে, শুধু এহসানের বদলা দিব, এহসানের বদলা তো ঋণ। আর ঋণ তো পরিশোধ করতেই হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا۔

যে তোমাদেরকে সালাম দেয় বা হাদিয়া দেয় (উভয় তাফসীরই করেছেন ওলামাগণ) তোমরা তার বদলায় তাকেও সালাম করো বা হাদিয়া দাও (তার চেয়েও উত্তম অথবা কমপক্ষে ততটুকু)।

প্রশ্ন এতটুকু নয় যে, অনুগ্রহকারীর উপর অনুগ্রহ। শুধু এতটুকু দ্বারাই ইজতেমায়িয়াত পয়দা হয় না বরং এর দ্বারা তওলিয়া হয় অর্থাৎ অমুকে আমার পক্ষে, অমুকে অমুকের পক্ষে, এর সম্পর্ক আমার সাথে, ওর সম্পর্ক ওর সাথে; শুধু এতটুকু হয় মাত্র।

ইজতেমায়িয়াত পয়দা হয় যে কষ্ট দেয় তার উপরও এহসান ও অনুগ্রহ করার দ্বারা। আর এটা এহসানেরও উঁচুস্তর। এহসান করনেওয়ালার উপর এহসান করা এহসানের নিম্ন স্তর। নবুওয়াতের শান হলো, তিনি এহসান করতেন যে কষ্ট দেয় তার উপর।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জায়েদ ইবনে সানাকে নিয়ে যাও ওমর। তাকে তার পাওনা দিয়ে দাও এবং ২০সা অতিরিক্ত দিবে। কম দিতে বলেননি যে, সে আমার সাথে বাড়াবাড়ি করেছে তাই তাকে কম দাও। না? তা বলেননি। কারণ, আমাদের এখানে ধর-পাকড় নেই। এটাতো রাজনীতির মেজায। যে আমার সাথে চলবে তাকে চালাব আর যে বাড়াবাড়ি করবে তার থেকে প্রতিশোধ নেব। দাওয়াতের মেজায এটা নয়। দাওয়াতের মেজায হলো বাড়াবাড়ি করনেওয়ালার উপর এহসান করা।

যখন যায়েদকে ২০সা অতিরিক্ত দেয়া হলো, তখন তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমার পাওনা তো পেয়েছি। অতিরিক্ত কেন দিচ্ছ? ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ২০ সা খেজুর অতিরিক্ত দিতে বলেছেন। কারণ, আমি তোমাকে তলোয়ার দিয়ে ধমক দিয়েছি। তার প্রতিদান স্বরূপ। অর্থাৎ আমি ভুল করেছি। আমি ভয় দেখিয়েছি। এ জন্য বেশি দিতে বলা হয়েছে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, যায়েদ তুমি ইহুদীদের বড় আলেম। তা সত্ত্বেও এ ব্যবহার কেন করলে নবীর সাথে?

হযরত যায়েদ বললেন, ওমর! আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেই বুঝতে পেরেছি তিনি নবী। কিন্তু একটা নিদর্শন পরীক্ষা করে দেখার ছিল তা পরীক্ষা করে নিলাম। তাই এমনটি করেছি। যাতে বুঝতে পারি ও নিশ্চিত হই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী। আর সেটা হলো, সবরের পরীক্ষা। এজন্য এটা বুনিয়াদি বিষয় যে, সবর সকল নবীর ইজতেমায়ী গুণ। নবীর প্রতি এর নির্দেশ হয়েছে।

فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ

নবীজী আপনি সবর করেন এবং আপনার সবর আল্লাহর জন্যই যেন হয়।

এমন নয় যে, আজ সবর করব কাল তার উপর ভিত্তি করে প্রতিদান চাইব। সবর করনেওয়ালা তো সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে এর কোনো প্রতিদান চায় না।

প্রথম বিষয় হলো, সবর এবং তা কতক্ষণ পর্যন্ত? মওত পর্যন্ত। হযরতজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, দায়ীর মওত হয় সবরের ময়দানে, আর কাফেরের মওত হয় খাহেশের ময়দানে।

সবর করনেওয়ালার জন্য হুকুম হলো সে ক্ষমা করে দিবে। কারণ, সবরের অর্থই হলো ক্ষমা করা। যে ক্ষমা করে না সে সবর অর্থাৎ ধৈর্য ধারনকারী হতে পারে না।

এ জন্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেছেন, আবু যর ক্ষমা করতে থাক। তেমনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নবীজী! আপনি ক্ষমা করতে থাকবেন। কেননা, এই গুণাবলী ইজতেমায়িয়াত বজায় রাখার জন্য মহা নোস্‌খা।

আমাদের সবচেয়ে বড় খারাবী আর দুর্বলতা হলো আমাদের এজতেমায়িয়াত ভেঙ্গে যাওয়া। এর একমাত্র সবব (কারণ) হলো, আমাদের মধ্যে দুশমনের প্রবেশ। যত রাজত্ব খতম হয়েছে তার পেছনেও কারণ ছিল এটাই যে, প্রথমে আপোষে একের উপর অপরের আস্থা নষ্ট হয়েছে। এটা দুশমনের বড় চাল বা যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্র যে, একের উপর অন্যের আস্থা নষ্ট করে দাও। এতেকরে তাদের ইজতেমায়িয়াত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যখন ইজতেমায়িয়াত নষ্ট হয়ে যাবে তখন যতই নামাজ, তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও যিকির-আযকার করুক আল্লাহ্‌র সাহায্য আর পাবে না। এটা পাকাপাকি কথা।

এ জন্য হযরতজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, তোমাদের নামায, তোমাদের যিকির, তোমাদের তেলাওয়াত এবং তোমাদের তাহাজ্জুদ

আরশেও যদি পৌঁছে যায় এবং তোমাদের দোয়াও যদি আরশে পৌঁছে যায় তবুও আল্লাহর সাহায্য আসবে না যদি আপসে ইজতেমায়িয়াত না থাকে। আর ইজতেমায়িয়াতের সবচেয়ে বড় আসবাব হলো, সাথীদেরকে ক্ষমা করার নিযাম তৈরি করা। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَاعْفُ عَنْهُ

হে নবী! আপনি ক্ষমা করুন তাদেরকে এবং يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ইজতেমায়িয়াতের উপর।

এজতিমায়িয়াত বলে দিল এক হওয়াকে। আর দিল এক হওয়ার জন্য আস্থা হলো পূর্বশর্ত।

আমি তো বলি, যদি স্ত্রীর উপর থেকেও আস্থা উঠে যায় তো ঐ দম্পত্তির ঐক্য খতম হয়ে যাবে। স্ত্রী যে নাকি ঘরের চৌকাঠ সেখানে যদি আস্থা নষ্ট হয় তাহলে সে ঘরও ধ্বংস হয়ে যাবে। স্ত্রীর উপর আস্থা না থাকা সংসার ধ্বংস হওয়ার কারণ। তেমনি আমাদের আপসের ইজতিমায়িয়াত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অন্যতম সবব হলো, আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ইজতিমায়িয়াতের উপর। সব দুর্বলতা সত্ত্বেও যদি ঐক্য বা ইজতিমায়িয়াত বাকি থাকে তো আল্লাহর মদদ থাকবে। আর যদি উঁচু দরজার আমলও হয় আর যদি ইজতিমায়িয়াত না থাকে তবে আল্লাহর সাহায্য থাকবে না।

কুরআনে পাকে ইজতেমায়িয়াতের আসারাত (প্রভাবসমূহ) বলা হয়েছে এবং অনৈক্যের আসারাতও (প্রভাব) বলা হয়েছে। কুরআনে পাকে যত মেছাল (উদাহরণ) বর্ণিত হয়েছে মুনাফিকদের, মুমিনদের, এসব উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে মুমিনদের জন্য। যেমন, নেফাকের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। এতে মুনাফেকদের সম্বোধন করা হয়নি। বরং মুমিনরাই সম্বোধিত অর্থাৎ মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। মানুষ মনে করে এটা মুনাফিকদের সাথে সম্পৃক্ত। নেফাকের আয়াত আর নেফাকের নিদর্শন এর সম্পর্ক মুমিনদের সাথে।

কুরআনে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, ঐক্যের ফায়দাও অনৈক্যের লোকসান বলার জন্য। কুরআনে ২টি মসজিদের আলোচনা করা হয়েছে। একটি হলো, মসজিদে কুবা। অপরটি হলো মসজিদে দ্বিরার। উভয়টি

বাহ্যত মসজিদ হলেও প্রত্যেকটির মাকসাদ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অথচ মসজিদ বলাই হয়, যে জায়গা আল্লাহকে সেজদা করার জন্য নির্ধারিত হয়। মসজিদে কুবাওয়ালারা পবিত্রতা খুব পছন্দ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, সেটাই মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর এবং যার মধ্যে অনেক এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, মসজিদে কুবাওয়ালারা ইস্তেঞ্জায় পানিও ব্যবহার করতেন, ঢিলাও ব্যবহার করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। কুরআনে পাকে এরশাদ হচ্ছে–

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

আল্লাহ তা'আলা অনেক পবিত্রতা পছন্দকারীদেরকে পছন্দ করেন। অন্যদিকে হলো মসজিদে দ্বিরার। সেখানে কিছু যুবক একত্রিত হয়ে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল। সেটাও মসজিদ। এমন নয় যে, মন্দির বা গির্জা বানিয়েছে। বরং মসজিদই বানিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল, মোকাবেলা করার এবং মুমিনদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার। মসজিদে দ্বিরারওয়ালাদের উদ্দেশ্য ছিল, ফিরাক তথা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। আর মসজিদে কুবাওয়ালাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা নবীকে নির্দেশ দিলেন, আপনি অবশ্যই এ মসজিদে যাবেন। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহে কুবায় যেতেন। আর মসজিদে দ্বিরার সম্পর্কে বললেন, নবীজী! আপনি কখনো সেখানে যাবেন না। কুরআনে বলা হয়েছে, মসজিদে দ্বিরারওয়ালারা কসম খেয়ে বলবে–

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ

আমরা তো কাজ ঠিকই করতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য ভালো ছাড়া কিছু নয়। মনোযোগ দিয়ে শুনুন! তারা কসম খেয়ে বলছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন এরা মিথ্যাবাদী। কারণ, তারা বলছে, আমরা ভালোর ইচ্ছাই তো পোষণ করেছি। কিন্তু তারা যদি ভালোরই ইচ্ছা করত তাহলে তো সাথী হয়ে কাজ করতো। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বললেন, নবীজী! আপনি সেখানে কখনো যাবেন না।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু নওজোয়ানদের হুকুম দিলেন, যাও! মসজিদে দ্বিরারে আগুন লাগিয়ে দাও। সুতরাং তাতে আগুন জ্বালিয়ে

দেয়া হলো। এর সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল তারা সকলেই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তারা বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ঐ জমিটি খালি পড়ে থাকলো।

এক সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে আকীল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তার কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার এ প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ বিন আকিলকে বললেন, মসজিদে দ্বিরারের জায়গাটি খালি পড়ে আছে। তুমি সেখানে ঘর বানিয়ে নাও। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলেছেন, আপনি সেখানে কদমও রাখবেন না। আর আমি সেখানে ঘর বানিয়ে থাকব? না তা হতে পারে না। আমি এ জায়গা চাই না। অন্য একজন সাহাবী আকরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তারও কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ঐ জায়গায় ঘর বানিয়ে নাও। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলার কারণে সে জায়গাটি নিয়ে নিলাম। আমি সেখানে ঘর বানিয়ে নিলাম। কিন্তু যতদিন ঐ ঘরে আমি ছিলাম ততদিন আমি নিঃসন্তান ছিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমাদের নিয়ত ফাসাদের হয় তবে এর প্রভাব তোমাদের সত্ত্বা পর্যন্ত নিহিত থাকবে না বরং তোমাদের সন্তান এবং ক্ষেত-খামারকেও হালাক করে দিবে। ঐ সাহাবী বলেন, যতদিন আমি ঐ ঘরে ছিলাম ততদিন আমার কবুতর ডিম দেয়নি। ঘরের মুরগীগুলোও তায়ের জন্য বসালাম, সে ডিম থেকেও বাচ্চা ফুটলো না।

আমি বলছিলাম যে, ঐক্যের কী ফল আর অনৈক্যের কী খারাবী?

প্রথম বিষয় হলো, আপসের ইজতেমায়িয়াতকে সর্বাবস্থায় বাকি রাখতে হবে। না গাওয়ারী বা অপছন্দনীয় হালাত বরদাশ্‌ত করা এ রাস্তার হাক্বীক্বত। এ রাস্তায় অপছন্দনীয় অবস্থা তো আসবেই। এ জন্যই নবীকে হুকুম করা হয়েছে নম্রতার। সাথীদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন। কেননা, শুরা কোনো দারোগা বা শুরা কোনো শাসক নয়। বরং শুরা তো খাদেম। আমাদের এ কাজে ফায়সালার বুনিয়াদ ফায়সাল হওয়া নয়। বরং ফায়সালার বুনিয়াদ হলো সাথীদের অন্তরকে মুতমাইন (শান্ত) করা। শাসক

শাসিতের লড়াই এই জন্য যে, হাকিম বা শাসকের ফায়সালার বুনিয়াদ সে শাসক। আমরা তো খাদেম, শাসক নই।

খাদেম তার মাখদুমকে বলে, আমার রায়, এভাবে হলে ভালো হয়। মাখদুম বলে, এভাবে করো, এভাবে করো। আমরা মাখদুম নই, আমরা হলাম খাদেম। শুরা খাদেম। কোনো গোত্রের শাসক সে-ই হয়ে যে খাদেম হয়। এ জন্যই প্রথম বিষয় হলো, নম্রতা অবলম্বন করুন সাথীদের সাথে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ

এ আয়াতে চারটি বিষয় বলা হয়েছে। যার প্রথমটি হলো নম্রতা।

দ্বিতীয় বিষয় হলো ক্ষমা করা। আমাদের এ কাজে ধর-পাকড় নেই যে, অমুককে ধর, অমুককে জিজ্ঞাসাবাদ করো যে, সে কেন এমনটি করল? ইত্যাদি। অনেক সময় এরও প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এটা ইজতেমায়ীভাবে নয়। ইনফেরাদীভাবে হতে হবে। খুঁজে বের করুন, তার সাথে কার ভালো সম্পর্ক আছে? তাকে দিয়ে চেষ্টা করুন। এমন না যে, আমাদের শুরা আছে। শুরার সামনে তাকে উপস্থিত করতে হবে।

গলতি ও ভুল করনেওয়ালার ভুলকে লুকানো এবং তাকে মুতমাইন করা হলো মেজাযে নবুওয়াত।

আমাদের মেজায হলো পুলিশের মতো যে, ভুল করনেওয়ালাকে ভয় দেখাও, ভীত করো। না ভাই। এটা তরবিয়তের রাস্তা নয়। তরবিয়তের রাস্তা হলো ভুল করনেওয়ার ভুল দেখেও এমন হয়ে যাও, যেন দেখইনি।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লহু তা'আলা আনহু রাতে বের হয়েছেন। এক ঘরের দরজা খোলা ছিল। দেখলেন, এক ব্যক্তি শরাব পান করছে। সাথে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও ছিলেন।

তাকে বললেন, দেখছো ঐ ব্যক্তি কী করছে?

তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো ঐ কাজ করলেন যা কুরআনে নিষিদ্ধ।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কিভাবে?

তিনি বললেন, আপনি তাজাস্‌সুস অর্থাৎ দোষ অন্বেষণ করলেন। যা কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমার এ গুনাহ কিভাবে খতম হবে?

তিনি বললেন, এ গুনাহের ক্ষমার রাস্তা হলো, আপনি এখান থেকে এমনভাবে সরে যান যেন আপনি কিছুই দেখেননি। আর ঐ ব্যক্তি বুঝতে না পারে যে, আপনি দেখেছেন। তাহলেই আপনার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করেন। আমাদের তবিয়ত তো এখন এমন হয়েছে (আমি আমার কথাই বলছি, আপনাদের কথা বলছি না।) যে গলত বা ভুল করনেওয়ালাকে ভুল করা অবস্থাতেই ধরে ফেলি। যাদের এই মেজায হয় খোদার কসম! তাদের দ্বারা উম্মতের তরবিয়ত কখনও হতে পারে না। তাজাস্‌সুস বা দোষ তালাশ কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। খোদার কসম! যিনা করনেওয়ালার তত বড় গুনাহ হয় না যত বড় গুনাহ এ ব্যক্তির হয়। যে যিনার সংবাদ দিয়ে দেয় বা গোপনীয়তা উম্মোচন করে। যিনা করনেওয়ালা যদি তওবা করে নেয় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু যে করে দিল তার কোনো ক্ষমা নেই। কেননা, যিনার ক্ষমা আছে, গীবতের ক্ষমা নেই। শিরকেরও তওবা আছে কিন্তু গীবতের ক্ষমা নেই। এ জন্য হুকুম হলো, কাউকে ভুল করতে দেখলে এমন হয়ে যাও, যেন তুমি তা দেখইনি। ধর-পাকড়, পিছে পড়া, দোষ তালাশ করা এগুলো আমাদের এ কাজে নেই। বরং ভুলকে লুকাও। ভুল করনেওয়ালাকে মুতমাইন করো। অর্থাৎ তাকে শান্ত করো।

এক মহিলা এলো হযরত ওমরের কাছে কিছু বলার জন্য। কাছে এসে বসল। সে কিছু বলবে, এমন সময় তার অযু ছুটে গেল অর্থাৎ বায়ু বের হয়ে গেল। মহিলাটি ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, মা! আরেকটু জোরে বলো। আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। মহিলাটি মুতমাইন হয়ে গেল যে, তাহলে তো ওমর আমার বায়ু বের হওয়ার শব্দটিও শুনতে পায়নি।

চিন্তার বিষয়। এমনটি বলেননি যে, তোমার মধ্যে কোনো আদব-কায়দা নেই। উঠ এখান থেকে। এটা তরবিয়তের এলেম। এ জন্যই বলছি, আমাদের এখানে ধর-পাকড় নেই। সহজ কাজ হলো, ভুল করনেওয়ালার

জন্য এস্তগফার করো। এর হুকুমও রয়েছে। নবীজী! আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ভুল কার না হয়? বড় বড় ভুল সাহাবাদের থেকেও প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ভুল থেকে কিছু বিষয় সামনে খোলাসা হয়ে এসেছে। তা হলো কোন্ ভুল ক্ষমার যোগ্য, আর কোন্ ভুল ক্ষমার অযোগ্য, আর ক্ষমা করলেই বা কতক্ষণ ক্ষমা করতে থাকবো? ইত্যাদি। এক সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার গোলামকে কতবার ক্ষমা করবো? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দিনে ৭০ বার ক্ষমা করবে।

৭০ এর সংখ্যা হাদিসে আধিক্য বুঝানোর জন্য আসে। অর্থাৎ অসংখ্য বার ক্ষমা করবে। যার কোনো সীমারেখা নেই।

এই যদি হয় গোলামের ক্ষমা, তাহলে সাথীর ক্ষমার ব্যাপারে কী ধারণা?

আল্লাহ ক্ষমা করলে তুমি কে বাধা দেওয়ার? এজন্য একটি উসূলী বিষয় হলো, সাথীর দ্বারা কোনো ভুল হলে তার গুণগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও। তার পূর্বের কুরবানীসমূহ দেখ। যখন কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি দিবে তখন তার ভুল অত্যন্ত হালকা মনে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় কমজোরি হলো, সাথীর কোনো ভুল দেখে তার সব কুরবানী ভুলে যাই। এর দ্বারা আমলা বা কাম করনেওয়ালারা হাতছাড়া হয়ে যায়।

আমাদের এ কাজে বরং গোটা শরীয়তে গুনাহের তাহকীক নেই। কারণ, গুনাহকে প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়। তাহকীক করলে কোনো সময় হয়তো চুরি প্রমাণ হবে। কিন্তু আমরা তো চুরি প্রমাণ করতে চাই না। আমরা ব্যভিচার প্রমাণ করত চাই না। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

এক সাহাবী ছিলেন হযরত মায়িযে আসলামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। একদিন তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। এসে বললেন, আমি যিনা করে ফেলেছি। নিজেই এসে বললেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শোনামাত্রই চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফেললেন। তিনি সেদিকে পুনরায় বললেন, আজ

আমাদের তো একটা শুনা সংবাদই যথেষ্ট। ব্যাস! একটা খবর পেলেই হলো। অমুকে অমুক কাজ করেছে। (চুরি করেছে বা এটা করেছে, ওটা করেছে) আর রক্ষা নেই তার।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়লো একটি হাদীস। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, এক ব্যক্তি এসে তোমাদের মধ্যে একটা কথা বলবে। আর সে কথা তোমাদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে যাবে। সাথীরা বলবে, এ কথাটা কে বলেছে? শ্রোতারা বলবে, হ্যাঁ! এমন এক ব্যক্তি বলেছে যাকে দেখলে তো চিনব কিন্তু নাম জানি না। হাদীসে স্পষ্ট এসেছে যে, সে শয়তান ছিল। তোমাদের মধ্যে একটি কথা চালিয়ে গেল।

অনেক শক্ত আয়াত। যার অর্থ হচ্ছে, "ঈমানদারদের মধ্য হতে যারা পছন্দ করে যে, মন্দের প্রসার ঘটুক। তাদের জন্য শক্ত আযাব রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে।

বলছিলাম যে, আমাদের এ কাজে কারো ভুল হলে তাহক্বীক নেই। বরং তাওয়ীল আছে। অর্থাৎ তার কোনো ভালো ব্যাখ্যা করা উচিত।

যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়িজে আসলামীর ব্যাপারে তাওয়িল করলেন। যখন সে বলল, আমি যিনা করে ফেলেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে হয় তুমি চুম্বন করেছ।

মায়িজ বললেন, না হুযুর আমি যিনা করেছি।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না মনে হয় তুমি স্পর্শ করেছ।

তিনি বললেন, হুযুর আমি তো যিনা করে ফেলেছি।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাওয়ীল করছেন যে, না তুমি বোধ হয় একটু আলিঙ্গন করেছ বা হাত লাগিয়েছো।

তিনি বললেন, না হুযুর আমি যিনা করে ফেলেছি।

আজ আমাদের অবস্থা কী? আমরা চাই, প্রমাণিত হোক। আর নবুয়তের শান হলো প্রমাণিত না হোক।

আরেকটি ঘটনা। উট চুরির দায়ে একজনকে ধরে আনা হলো। চুরি প্রমাণিত হলো। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলছেন, তুমি বোধ হয়ে নিজের উট মনে করে রশি খুলেছিলে।

সে বল্ছ না আমি অন্যেরটা বুঝেই খুলেছি।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, জল্লাদকে ডাকো এবং হাত কাটো।

জল্লাদ এলো। তেল গরম করা হলো। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আসছি। একটু অপেক্ষা কর। আমি আসা পর্যন্ত কিছু করো না। একটু পর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর? কেন এসেছো? কী ব্যাপার? তুমি কি চুরি করেছ? এসব প্রশ্ন এমনভাবে করা হলো যে, মনে হলো যেন তার সাথে আগে কোনো কথাই হয়নি।

সে বলল, না। চুরি করিনি।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যাও তাহলে চলে যাও।

লোকেরা বলল, আমীরুল মুমিনীন! একটু আগে চুরি সাব্যস্ত হলো। আপনি হুকুম করলেন, তেল গরম করতে। এখন বললেন, চলে যাও। ছেড়ে দিতে।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তার স্বীকারোক্তির উপর হাত কাটতে বলেছি। আর তার অস্বীকার করার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

আজ আমরা না জানি কোন রাজনীতিতে পড়েছি। তাজাস্সুস করনেওয়ালার দ্বারা তো কখনও তরবিয়ত হতে পারে না। তরবিয়ত আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তিদের দ্বারা করাবেন যারা সাথীদের দোষ নিজ সন্তানের মতো (অর্থাৎ সন্তানদের দোষ যেভাবে লুকানো হয় সেভাবে) লুকাবে। এ জন্য বলছি, ভুল হলে সাথীর কুরবানীর দিকে দৃষ্টি দাও।

এক জানাযা আনা হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। জানাযা রাখা হলো। হুযুর নামায পড়াবেন। ওমর রাযিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু এলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযার সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি জানাযার নামায পড়াবেন না। দেখুন! জানাযা মুসলমানেরই ছিল। কি ব্যাপার? ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, লোকটি এত বড় দুষ্ট ও ফাসেক প্রকৃতির ছিল যে, তার জানাযায় আপনার দাঁড়ানো আমার পছন্দনীয় নয়। আমরা কেউ পড়িয়ে দিব। কিন্তু আপনি পড়াবেন না। চিন্তা করুন, লোকটি কত খারাপ হতে পারে? যে, আল্লাহর নবী তার জানাযা পড়াবেন তা হযরত ওমরের পছন্দ না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দিয়ে এলান করালেন, আপনাদের কেউ কি এ ব্যক্তিকে কোনো ভাল আমল করতে দেখেছেন? একজন বললেন, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ এ ব্যক্তি অমুক জায়গায় এক রাতে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়েছে।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়েছে ও রাত জেগেছে সে চোখ জাহান্নামের আগুন দেখবে না।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর তুমি পেছনে যাও। এটা কাফেরের জানাযা না মুমিনের? এতটুকু তো জিজ্ঞাসা করতে পার। কিন্তু কোনো মুসলমানের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার হক তোমার নেই।

হযরত হাতেব ইবনে বালতা'আ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন এক বদরী সাহাবী। তিনি এমন একটা ভুল করলেন যার চিন্তাই করা যায় না সাহাবাদের থেকে। ঘটনা এজন্য বলছি যে, যখনই কোনো সাথী ভুল করে বসে তখন তার কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি দাও। হযরত হাতেব ইবনে বালতা'আ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ভুল এই হলো যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকার্‌রমার উপর হামলা করার ইচ্ছা। হাতেব ইবনে বালতা'আ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুফফারে মক্কাকে জানানোর ব্যবস্থা করেন। চিঠি দিয়ে জানানোর চেষ্টা করেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় দল নিয়ে তোমাদের উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর এত বড় দল নিয়ে আসছেন যে, তোমাদেরকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই ভুলটা এত বড় যে, এটা ইসলাম ও মুসলমান সবার জন্য ক্ষতিকর ছিল। চিঠিটি একজন মহিলার

মাধ্যমে মক্কায় প্রেরণ করলেন। চিঠিটি পৌঁছানোর জন্য ঐ মহিলা রওয়ানা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর সম্পর্কে অবগত করালেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান ও মেকদাদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পাঠালেন। যাও, ঐ মহিলাকে অমুক জায়গায় পাবে। তার থেকে চিঠিটা নিয়ে এসো। তারা রওয়ানা হলেন। যথাস্থানে পৌঁছে মহিলাটিকে পেয়েও গেলেন তারা। তাকে বললেন, চিঠিটা দাও। মহিলা বলল, কিসের চিঠি? তারা উভয়ে বলল, চিঠি বেরকরো বলছি, নইলে খারাপ হবে। চাপ প্রয়োগ করতেই সে চিঠিটি বের করে দিল। তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চিঠিটি এনে পেশ করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেব ইবনে বালতা'আকে ডেকে বললেন, তুমি এটা কী করলে? হাতেব ইবনে বালতা'আ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন মক্কায় আছে। আমি একা হিজরত করেছি। আমি মক্কার কাফেরদের উপর এ উদ্দেশ্যে এই এহসান করতে চাইলাম যে, তারা আমার পরিবার-পরিজনের উপর রহম করবে। এহসান করবে।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তো একে কতল করে দেব।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না ওমর। তুমি কি জানো না যে, সে বদরী সাহাবী? আর আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবী সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা চাও করো। তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

চিন্তা করুন! কত বড় ভুল, অথচ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওমর! সে তো বদরী সাহাবী। আর বদরীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এজন্য বলছি, নিজ সাথীদের দুর্বলতার সময় তার কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি দাও। তার ভালাইয়ের দিকে তাকাও। তার দুর্বলতার দিকে তাকাবে না। চাই সাথী নতুন হোক বা পুরাতন। হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা সকলেই ভুল করনেওয়ালা। তাহলে কে ভুল করে না? সবাই তো ভুল করে বরং সবচেয়ে বড় ভুল করনেওয়ালা সে যে বলে, আমার কোনো ভুল নাই।

এই কাজ করনেওয়ালারা কোনো ফেরেশ্তা নয় যে, ভুল হবে না। আর ভুল-চুক করনেওয়ালারাইতো কাজ করবে। এ জন্য নিজ সাথীকে মু'তামাদ তথা আস্থাভাজন বানাও। যত ইত্তেহাম তথা অপবাদ সত্য-মিথ্যা সব অনাস্থার কারণে হয়ে থাকে। এর ফায়দা তো এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, শত্রু পক্ষের জন্য রাস্তা খুলে যাবে ভিতরে ঢুকার। যখন আমার কাছে অভিযোগের চিঠি পৌঁছলো তখন আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম যে, আমাদের কাকরাইলের এ অবস্থা হলো যে, ইজতেমায়িয়াত খতম হয়ে গেল। কত বড় কমিনাপন তথা নিকৃষ্টতার কথা। কত নীচু পর্যায়ের কথা।

মেরে দোস্তো!

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যমানায় এক মেয়ে থেকে যিনা প্রকাশ পেল। যিনার কারণে তার কুমারিত্ব শেষ হয়ে গেল। যখন ঐ মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এলো, তখন মেয়ে পক্ষ চিন্তা করলো আমাদের মেয়ের মধ্যে তো একটা দোষ আছে। যেহেতু বিয়ে-শাদি একটা মু'আমালা তাই ছেলে পক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করানো দরকার। বিয়ে হলে হবে আর না হলে যা হওয়ার তাই হবে। কপালে যা আছে তাই ঘটবে। তখন ঐ মেয়ে পক্ষ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এ ব্যাপারে জানার জন্য জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কি ছেলে পক্ষকে মেয়ের কোন দোষ থাকলে বলে দিব?

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমরা ঐ মেয়ের বিবাহ এভাবে দাও যেভাবে এক কুমারী মেয়ের বিবাহ দিয়ে থাক। যদি তার দোষের কথা ছেলে পক্ষকে বলো তাহলে এমন শাস্তি দিব যে, তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে সারা দেশের জন্য।

এটা আমাদের জন্য রাস্তা। নিজ চোখে দেখা বস্তুকেও অস্বীকার করো। নিজ মু'আশারাকে পাক রাখো। অন্যের কমজোরি দেখ না। ভুলের ভালো ব্যাখ্যা করো। সাথীদের কমজোরি সত্ত্বেও তাদের থেকে কাজ নাও। কেটে দিও না। আমাদের এখানে কাটার প্রশ্নই আসে না। কারণ, এ কাজ থেকে কেউ অব্যহতি পেতে পারে না। এ কাজে অবসর নেই। এ কাজে মা'যুল হতে পারে না। অর্থাৎ ওজর থাকতে পারে যে, কাজে জুড়তে পারছে না।

যেমন অসুস্থ, বৃদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু মা'যূল তথা অপসারণ করার রীতি আমাদের এ কাজে নেই। কেননা, আমাদের এটা কোনো কোম্পানী নয়।

আমাদের এটা কোনো জামা'আতও নয়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, জামা'আত শব্দটিই বিভেদ সৃষ্টি করে যে, আমরা অমুক জামাত আর তোমরা আরেক জামাত। না ভাই! আমাদের এ কাজ কোনো জামা'আতের (দলের) নয়। এটা অমুক দল, ওটা অমুক দল। আমাদের নাম তো উম্মত। উম্মতী হয়ে কাজ করো। সাথীদের উপর আস্থা রাখো। সাথীদের কমজোরি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কাজে ব্যবহার করো।

ইজতিমায়িয়াতের জন্য আরেকটি হুকুম হলো, নিজ সাথীদের সাথে মাশওয়ারা করো। সব কমজোরির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, মাশওয়ারার কমজোরি (দুর্বলতা)। সব মতানৈক্য মাশওয়ারার কমজোরির (দুর্বলতার) কারণে হয়ে থাকে।

সাথীদের সাথে মাশওয়ারা করো। মাশওয়ারার চেয়ে উঁচু কোনো ইজতেমায়ী আমল নেই। কেননা, মাশওয়ারা উম্মতকে নিয়ে চলার আমল। নবীকে হুকুম করা হয়েছে মাশওয়ারা করার জন্য। অথচ হাদিসে এসেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাশওয়ারার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মাশওয়ারার উর্ধ্বে বা মাশওয়ারার অমুখাপেক্ষী।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা গায়েব জানেন। আর নবী তো আল্লাহ তা'আলার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সুতরাং তাদের উভয়ের মাশওয়ারার প্রয়োজন নেই। এরপরও নবীকে মাশওয়ারার হুকুম করা হয়েছে।

লক্ষ্য করুন! আমাদের ইজতেমায়িয়াত তখনই শেষ হয় যখন উমূরসমূহ সাথীদের থেকে লুকানো হয়। লুকানো কেন হয়? এই জন্য যে, জানলে অমুকে অমুকে বিরোধিতা করবে। তারা এদের লোক। তাই এদের থেকে লুকাও। ওদিকে তারাও পৃথক এক জামা'আত বানিয়ে নিল। এসো আমরা ভিন্ন রায়ওয়ালারা জমা হই।

এই জন্য মাশওয়ারাকে ইজতিমায়িয়াতের উপর আনো। মাশওয়ারার চেয়ে বড় কোনো ইজতেমায়ী কাজ নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে মাশওয়ারাকে নামাজের সাথে জুড়েছেন। কেননা, উভয় কাজ

ইজতিমায়ী। নামায ও মাশওয়ারা। নামাযের চেয়ে বড় কোনো রুকন নেই ইসলামে। আর মাশওয়ারা ছাড়া বড় কোনো আমল নেই দাওয়াতের কাজে। দাওয়াত ও ইবাদতের বড় বড় দুইটি আমল সূরায়ে শুরার মধ্যে এসেছে। এখানে বলা হয়েছে, "এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো।"

এতে উদ্দেশ্য হলো, যদি মাশওয়ারা সহী হয় এবং যদি মাশওয়ারা অনুযায়ী সাথীরা চলে তবে সাথীদের যোগ্যতার সঠিক ব্যবহার হবে।

এজন্য মাশওয়ারাকে ইজতিমায়ী বানাও। ইজতেমায়ী এটা নয় যে, ৫জন মিলে একটা সিদ্ধান্ত করে নিল, ৬ষ্ঠ কারো এর খবর হলো না। আর এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, যে বিষয়ের সাথে যে যে সংশ্লিষ্ট তার সাথে সেই বিষয়ে মাশওয়ারা হবে। এমন নয় যে, সব মাশওয়ারা সবার সাথে করতে হবে। এটা একটা উসূলী কথা। আমি নিজে থেকে একথা বলছি না বরং আমি হযরতের কথা নকল করছি। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, সব বিষয়ের সম্পর্ক সবার সাথে নয়। যে বিষয় আপনার সাথে সম্পর্কিত নয়, সে বিষয়ের মাশওয়ারা আপনার সাথে হবে না। সাথীদের থেকে রায় নেয়ার এহ্‌তেমাম করো যে, মাশওয়ারা ইজতেমায়ী আমল, তাকে ইজতেমায়ী বানাও।

মাশওয়ারা ইজতেমায়ী হওয়ার দুইটি শর্ত।

১. যতদূর সম্ভব নিজ তাকাযা কুরবানী করে মাশওয়ারাতে অংশগ্রহণ করো। চাই যতই কষ্ট হোক না কেন। এক ব্যক্তির সাথে ইমাম সাহেবের ঝগড়া হলো কোনো ব্যাপারে। তাই বলে কি নামায ছেড়ে দিবে? এটা কি সম্ভব? ঝগড়া ঝগড়ার জায়গায়। তাই বলে তো নামায ছাড়া যাবে না। ঝগড়া ইমামের সাথে, নামাযের সাথে নয়। ঠিক তেমনি মাশওয়ারা ওয়ালাদের কারো সাথে বিতর্ক হলো, তাই বলে কি মাশওয়ারা ছেড়ে দিব? আমার মসজিদ, আমার নামায তো আমাকে পড়তেই হবে। এমনকি রুকু সেজদায় তাকে অনুসরণও করতে হবে। এমন না যে, ঝগড়ার কারণে আমি পৃথক রুকু বা পৃথক সেজদা করব। তেমনি আমাদের মাশওয়ারাওয়ালাদের সাথে ঝগড়া হয়েছে বলে মাশওয়ারাও ছাড়া যাবে না। অনুসরণও ছাড়া যাবে না।

২. যদি আমার রায় মানা হয় তাহলে এস্তেগফার করব। আর যদি মানা না হয় তাহলে শোকর আদায় করব। সবর না। অনেকে বলে সবর করো। না, এটা সবরের মাকাম না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি নিজ রায়ের উপর (না মানা হলে) সবর করবে সে পেরেশান হবে। কারণ, এটাতো শোকরের মাকাম।

আমার রায় অনুযায়ী যদি ফায়সালা হতো তাহলে এই জিম্মাদারী আমার উপর বর্তাবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে (কেয়ামতে)। কারণ, যত রায় দেয়া হয় খোদার কসম! ঐসব রায় আল্লাহর কাছে লিখা হয়। কুরআনে এসেছে, নিশ্চয়ই প্রত্যেকের কান, চোখ, অন্তর জিজ্ঞাসিত হবে। তখন বের হয়ে আসবে, কার রায় নফসানিয়াতের ভিত্তিতে ছিল। কার রায়ে হাসাদ (হিংসা) ছিল? কার রায়ে খাহেশাত ছিল। আর কার রায়ে ছিল দাওয়াতের ফিকির। এটা পাকাপাকি কথা। এ জন্য বলা হয়, মাশওয়ারাতে বসার আগে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হওয়া চাই। নিজ রায় দেয়ার আগে ভালো করে খেয়াল করুন যে, আমার রায়ে কোনো খাহেশ নেই তো? এজন্য সর্বাবস্থায় মাশওয়ারাতে অংশগ্রহণ করা চাই।

আমাদের মেহনতে গেট আউট নেই। এটা তো রাজনীতির কাজ। আমার কথা মানলে আসবো নয়তো নয়। না আসলে তুমিই কাজ থেকে বঞ্চিত হবে। মনে করবে মাশওয়ারাতে না জুড়লে কী হবে? মহল্লার কাজ করব, গাশ্‌ত করব। নিজ মসজিদের মেহনতে জুড়বো। সমস্যা কি যদি আমি মাশওয়ারায় না জুড়ি? না। এটা তো আম মানুষের জন্য। আমাদের জন্য হলো, যে মাশওয়ারা থেকে কেটে যাবে সে কাম থেকে সরে যাবে। এজন্য মাশওয়ারাকে ইজতেমায়ী বানাও। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগে একজনও যদি মাশওয়ারাতে অনুপস্থিত থাকতেন তবে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার ঘরে যেতেন এবং জানতে চাইতেন যে, সে কেন মাশওয়ারায় এলো না?

মাশওয়ারাকে ইজতেমায়ী বানানোর দ্বিতীয় বিষয় হলো, সাথীদের থেকে রায় নিন। একা একা ফায়সালা করবেন না। যেখানেই একাকী ফায়সালা হবে সেখানেই এখতেলাফের সৃষ্টি হবে। সীরাত পড়লে এমনটিই দেখা যায়। যখনই ফয়সালা একা একা (উমুমী মাশওয়ারা ছাড়া শুধু

ফায়সালের ফয়সালায় হয়েছে) তখনই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কোনো এক এলাকাওয়ালা, কোনো এক জেলাওয়ালা এসে জিজ্ঞাসা করল বা জানতে চাইল, আজকাল (এখনকার) ফয়সাল কে?

কেউ বলে দিল অমুকে ফয়সাল।

বলল, আচ্ছা। ঠিক আছে। চল ফায়সালকে জিজ্ঞেস করে নেই।

তারপর ফায়সালের কাছে চলল। ফায়সালের তখন বলতে হবে, অমুক সময় আমাদের মাশওয়ারা আছে। সেখানে সাথীরাও থাকবেন তখন আসবেন। কুরআনেও এমনই ইশারা পাওয়া যায়। হে ঈমানদাররা! আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ কর এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত (যিম্মাদার) রয়েছে।

যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাও। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরিকার উপর মাশওয়ারাকে আনো। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হও এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং সুন্দর তাওয়ীল।)

জিজ্ঞেস করনেওয়ালা একা, ফায়সালা করনেওয়ালা একা, তখনই এখতেলাফ হবে। যখন নিজ জেলায় গিয়ে কাজ করবে তখন এখতেলাফ হবে।

মেরে মোহতারাম দোস্তো!

আমরা চাই যে, কাজ ফায়সালা দিয়ে চালাব না। এই কাজ তো সাথীদের রায়ে ও ইজতেমায়ী মাশওয়ারায় চলবে। মাশওয়ারাকে নামাযের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ফায়সাল ইমাম এবং মুক্তাদীর মত যে, ইমাম ভুলে গেলে মুক্তাদি মনে করিয়ে দিবে ও লোকমা দিবে। হানাফী মাযহাব মতে যদি কোনো একজন নামাযের বাহির থেকে লোকমা দেয়, আর ইমাম লোকমা নেয় তাহলে সবার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তরতীব হলো, নামাযে শরীক হয়ে লোকমা দাও। তাহলে তোমার লোকমাও শোনা হবে।

তবুকের যুদ্ধে সাহাবাদের খাদ্য শেষ হয়ে গেল। সাহাবাদের খুব ক্ষুধা দেখা দিল। এক সাহাবীর জযবা, সে উট জবেহ করে খাওয়াতে চাইলেন। এ জন্য তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অনুমতি

চাইলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। যখন তিনি উট জবেহ করার জন্য গেলেন তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাধা দিলেন। লোকটি বললেন, আমি অনুমতি নিয়ে এসেছি। হুযুর অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তবুও জবেহ করতে দিলেন না যে, তুমি একা একা কেন জিজ্ঞেস করেছো? আমাদেরকে সাথে রাখতে। চল একসাথে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযুরকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী করেছেন? আমাদেরকে যদি কেউ বলে, কী করেছেন, তাহলে আমাদের বড় গোস্বা আসবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী ব্যাপার?

ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কি উট জবাই করার অনুমতি দিয়েছেন?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রায় তো এমন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কথাই ঠিক। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ফায়সালা ফিরিয়ে নিলেন।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি বরকতের দু'আ করে দিন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন। খাদ্যে এত বরকত হলো যে, সাহাবাদের পক্ষে এত খাদ্য উঠিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে গেল। সাহাবাদের ব্যাগ, বস্তা সব ভরে গেল। এমনকি সাহাবারা জামার হাতা ভরে খাদ্য নিলেন। এ ঘটনা থেকেই বুঝা গেল যে, মাশওয়ারা ইজতিমায়ী হলে বরকত আর মাশওয়ারা ইজতিমায়ী না হলে এখতেলাফ তথা মতানৈক্য।

নিজ রায়ের উপর এসরার (পীড়াপীড়ি) করবে না। যে রায় দিলো সে তার উপর এর দায়িত্ব পুরো করে দিলো। এখন আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হবে। হক কথার উপরও এসরার (পীড়াপীড়ি) ঠিক নয়। হক কথার উপরও এসরার করা গলদ। যেমন হুদাইবিয়ার সময় হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসরার করতে লাগলেন যে, আমরা ওমরা করে যাবো। ওমরার জযবা তো ভালো। তেমনি যারাই এখতেলাফ করে তাদের জযবাও ভাল। এমন না যে, তারা গলদ কিছু চায়। ভালো জযবার কারণেই তো বিরোধিতা করে। কিন্তু হুকুম তার বিপরীত। আর এমনটা আল্লাহ তা'আলা এজন্যই করেন যে, আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান এদের মধ্যে মানার যোগ্যতা কতটুকু তৈরি হয়েছে।

এক ব্যক্তি ব্যভিচারের অনুমতি চাচ্ছে। তাকে বলা হলো, না। এটা হারাম। সে যিনা থেকে বিরত থাকল। সে নেকি পাবে। কারণ, হারাম থেকে বিরত থাকল। কিন্তু এক ব্যক্তি ওমরা করতে চায় যা বাইতুল্লাহ ছাড়া গোটা পৃথিবীতে কোথাও করার অবকাশ নেই। নামায, যাকাত, রোজা সারা দুনিয়ায় করা যেতে পারে। কিন্তু ওমরা এক বাইতুল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব নয়। ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জযবা ওমরা করব। কিন্তু হুকুম হলো, না! ওমরা করবে না। ফিরে যাও। এটা এজন্যই ঘটেছে যে, আল্লাহ দেখতে চান, এদের মধ্যে নবীর এতা'আতের যোগ্যতা কতটুকু? এজন্যই ভালো জযবার বিপরীত হুকুম আসে। ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসরার করলেন যে, না। আমরা হকের উপর আছি। আমরা ওমরা করব।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি সেদিন রায়ের উপর এসরার করেছি। এটা বলেননি যে, আমি হকের উপর ছিলাম। বরং তওবা করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমার সেদিনের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। কেন আমি রায়ের উপর এসরার করলাম? একটু ভাল করে চিন্তা করুন ভাই! সাথীরা ভালো জযবার কারণেই এসরার করে। না ভাই! নিজ রায় দিয়ে অবসর হয়ে যান। যখনই কোন সাথী ও শুরার রায়ে এখতেলাফ বা মতানৈক্য সৃষ্টি হয় বা এখতেলাফ দেখা দেয় তখন খোলাফায়ে রাশেদীনদের (প্রথম শুরাদের) দেখুন। তারা তাদের সময় তাদের সাথীদের রায়ের কি রকম এহ্‌তেরাম করতেন? এসে গভীর ভাবে চিন্তা করবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা

আনহুর মধ্যে মাশওয়ারায় এমন এখতেলাফ হতো যে, যারা দেখতেন তারা ভাবতেন, আজকের পর বোধ হয় আর কোনো দিন তারা একত্রিত হবেন না। কিন্তু মজমা থেকে ওঠার পর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আগের চেয়েও ভাল হয়ে যেতো।

মাশওয়ারাওয়ালাদের শুরা হযরতদের আমি একটা কথা বলছি যে, যখন তাদের আপসে কোন বিষয়ে এখতেলাফ হয়ে যায়, তখন তারা একে অন্যের রায়কে এমনভাবে এহ্তেরাম করবেন যেমন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একে অন্যের রায়কে এহতেরাম করতেন। এটা অত্যন্ত জরুরি। যদি এমন না করা হয় তাহলে খোদার কসম! দুশমন ঢুকে পড়বে। অর্থাৎ যতক্ষণ একে অন্যের রায়ের এহতেরাম করবে এবং শুরার মধ্যে কোনো ফাটল না ধরবে ততক্ষণ বহিরাগত দুশমন ভিতরে ঢুকতে পারবে না। মাশওয়ারাই হরো ফেতনা বাসুলহ (সন্ধি) করার দরজা।

যদি মাশওয়ারা ফেটে যায় অর্থাৎ এর উসুল নষ্ট হয় তাহলে দরজা ফেটে যাবে। অর্থাৎ দুশমনের প্রবেশের রাস্তা খুলে যাবে।

কাজ যাতে আমার আপনার মন মতো না হয় বরং কাজ সীরাত প্রদর্শিত রাস্তা অনুযায়ী হয়। যদি কাজ সীরাত (নবী ও সাহাবাদের জীবন) থেকে সরে যায় তাহলে আর আল্লাহর সাহায্য থাকবে না।

দুই ব্যক্তি এসে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, এই অমুক জমিনটা আমাদেরকে দিয়ে দিন। কারণ, তা বেকার পড়ে আছে। যদি আমাদের দেন তাহলে আমরা মেহনত করে কৃষি কাজের উপযোগী বানিয়ে নেব। ভাল কথা। সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ সময়ে উপস্থিত সাথীদের সাথে মাশওয়ারা করে নিলেন। (চিন্তা করার বিষয় হলো, ফায়সালাটি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর)। শেষে এতটুকু বলে দিলেন, দলিল (কাগজ) তো পাকা করে দিলাম তবে তোমরা ওমরের স্বাক্ষর নিয়ে তাকে সাক্ষী করে নিও। যাতে তার যেহেনেও থাকে যে, এ জমিন তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

উকিলের দায়িত্বে ছিলেন হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁরা কাগজ নিয়ে গেলেন হযরত ওমরের কাছে। গিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আবুবকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কাগজ দিয়েছেন। আপনি দস্তখত করে দেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা পড়লেন। যেখানে জমিন দেয়ার কথা লিখা ছিল ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা থুতু দিয়ে মিটিয়ে দিলেন। এরপর কাগজটি ছিড়ে ফেললেন। (থুতু দিয়ে মিটালেন এ জন্য যে, যাতে পরে আবার কাগজ জোড়া দিয়ে জমিন না নিয়ে নেয়। আমাদের জামানায় যদি এ ঘটনা ঘটতো তাহলে তো কেয়ামত ঘটানো হতো।) আর বললেন, যাও জমিন পাবে না। এটাও বললেন, যদি তোমরা এ ঘটনার কারণে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তো সাহায্য পাবে না। আর তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করতে পারো। তারা ফিরে এলেন।

হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, আমীর আপনি না ওমর? দেখুন! এটা হলো আপসের সুসম্পর্কের দৃশ্য। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমীর তো ওমরই। অথচ আমীর হলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজেই। কিন্তু বুঝলেন যে, আমার সাথীর আমার রায়ের সাথে এখতেলাফ হয়েছে। বললেন, আমীর তো ওমরই। তবে এতা'আত আমার করবে। তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখলেন একজনের কাছে ইমারত (আমিরত্ব) অপরজনের এতা'আত (অর্থাৎ তাকে মানতে হবে)। তাই চুপ হয়ে গেলেন। আর কোনো রাস্তা থাকলো না। আজ আমাদের সব এখতেলাফ ব্যক্তি সম্পর্কের কারণেই হয়ে থাকে।

এজন্য প্রথমে আপসের ইজতেমায়িয়াতকে দেখুন। এসব ঘটনা আমাদের জন্য রাস্তা বা রোড সাইন (যেমন রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় লিখা থাকে, অমুক স্থান এদিকে, অমুক স্থান ওদিকে।) এজন্য মাশওয়ারাকে ইজতেমায়ী বানান। সাথীদের থেকে রায় নিন। রায়ের এহ্তেরামও করুন। চাই রায় যতই ভুল রায় হোক না কেন? হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম বিলকিসকে পত্র লিখলেন।

(কাফের) সূর্যপূজক বিলকিস ঐ পত্র পড়েই বলল, আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেব না যতক্ষণ না আমি আমার অন্যান্য সরদারদের রায় না নিব।

হযরতজী বলতেন, সে তো বাতিলের উপর থেকেও মাশওয়ারা করেছে। আর আমরা হকের উপর থেকেও মাশওয়ারা করি না। বাতেল তো বাতিলের উপর থেকে একত্র হচ্ছে মাশওয়ারা দ্বারা। আর আমরা হকের উপর থেকেও বিক্ষিপ্ত হচ্ছি মাশওয়ারা ছেড়ে চলার দ্বারা।

রানী বিলকীসের সরদাররা বলল, আমরা তো শক্তিশালী যোদ্ধা। কিন্তু আপনি যা বলেন, (তাই হবে)। এর দ্বারা বুঝা গেল, যিম্মাদার যখন রায় নিবে তখন সাথীরা তার উপরই জমবে। তার দিকেই ফিরবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, দুশমন প্রবেশের দুইটি রাস্তা। এক রাস্তা হলো মালের, অন্যটি হলো অনাস্থা সৃষ্টি হওয়া। সবচেয়ে বড় কারণ বা মাধ্যম হলো মাল। আমাদের এ কাজের বুনিয়াদ হলো, মাল রদ করা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা। মাল প্রত্যাখ্যান করাও নবুয়াতের পরিচয়। বিলকিস হাদিয়া পাঠিয়ে পরীক্ষা করেছেন যে, সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম কি বাদশাহ না নবী?

সে যদি কবূল করে তাহলে বুঝা যাবে তিনি বাদশাহ। আর যদি নবী হন তাহলে তিনি তা ফেরত দিবেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম হাদিয়া আসার আগেই জানলেন, হাদিয়া কী আসছে? হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম নিজ দরবারের পুরো ফ্লোর স্বর্ণের বানালেন। যাতে তারা বুঝে যে, তারা তো স্বর্ণের এক ইট হাদিয়া এনছে অথচ সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের গোটা দরবারই স্বর্ণের এবং তিনি একটা স্বর্ণের ময়দানও বানালেন। সেখানে গৃহপালিত পশুও ছেড়ে দিলেন। গরু, ছাগল, মহিষ সেখানে পেশাব করে ও গোবর ত্যাগ করে। ঐ ময়দানের এক জায়গায় এক ইট পরিণাম জায়গাও খালি রেখে দিলেন।

ভাই! সব চেয়ে বেশি হেকমত হলো মাল প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে। খোদার কসম খেয়ে বলছি, যারা মালের পেছনে পড়ে তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে যায়। মালওয়ালারা কাজ করনেওয়ালাদের কিনে নিয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কথা এটা। কোনো গোপন কথা নয়। মালওয়ালারা কাজের মধ্যে দখলদারি করে।

একটি ঘটনা মনে পড়ল। হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদের হাউজ বানাচ্ছিলেন। হযরত মিস্ত্রিকে দেখিয়ে দিলেন এভাবে এভাবে কাজ করো। হযরতের এক মুরীদ হযরতের সাথে খুব সম্পর্ক রাখতেন। তিনি হযরতকে বললেন, মসজিদের হাউজের কাজ চলছে। আমি একটু আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করতে চাই। প্রথমে হযরত না করলেন। লোকটি বারবার পীড়াপীড়ি করায় তিনি রাজি হয়ে তার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর হযরত বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় শুনছেন বাহির থেকে মিস্ত্রির কথার আওয়াজ আসছে যে, "হযরত তো এভাবে নয় এভাবে বলেছেন"। অর্থাৎ টাকা দানকারী ব্যক্তি কাজের কোনো একটা বিষয় নিজ থেকে বলছিল। হযরত থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাহিরে এসে ঐ লোকটিকে তার টাকা হাতে দিয়ে বললেন, এক্ষুণি বিদায় হও। তুমি টাকা দিয়ে আমার কাজে দখলদারি শুরু করেছ? মাওয়ালারা কাজে দখলদারী করে থাকে।

এজন্য মালওয়ালাকে শরমিন্দা করো। যেমনটি হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম করেছেন যে, গোটা ময়দান গরু-ছাগলের আস্তাবল স্বর্ণের বানিয়ে দিয়েছেন। কারণ, আনেওয়ালা তথা হাদিয়া দেনেওয়ালা যখন দেখবে তখন শরমিন্দা (লজ্জিত) হবে। সে মনে মনে বলবে, যার নিকট এত স্বর্ণ আছে, তাকে এক ইট দিয়ে সূর্যকে মোমবাতি দেখিয়ে লাভ কি? বিলকিসের হাদিয়া নিয়ে যে আসছিল, সে ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে এক ইট ফাঁকা রেখেছিলেন। সে তার কাছে থাকা ইটটা দ্রুত ঐ ফাঁকা জায়গায় রেখে দিল। আর ভাবতে লাগলো, যদি লোকেরা আমার হাতে এ ইটটি দেখে তাহলে লোকেরা ভাববে, হয়তো আমি ইটটি চুরি করেছি। তার চেয়ে হাদিয়া না দিয়ে জান বাঁচাই।

এটা ছিল সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের হেকমত। আমাদের বুনিয়াদই হলো, মাল প্রত্যাখ্যান করা। আর আল্লাহ তা'আলার খাযানা হতে সরাসরি নেয়ার রাস্তার উপর আসা। হযরতজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যার নযর মালওয়ালাদের দিকে গেল সে নিজের উপর আল্লাহ তা'আলার খাযানা থেকে নেওয়ার দরজাকে বন্ধ করে দিল।

সাথীদের মধ্যে এ'তেমাদ বা আস্থা বৃদ্ধি করুন। যদি এমন কিছু হয়েও যায় তো সেটাকে সেখানেই শেষ করে দিন। বসে আপসে ঠিক করে নিন।

এমন না যে, আমাকে কে কী করতে পারবে? না ভাই! আপনার তো কিছুই হবে না। যা হবে তা তো ক্ষতি হবে কাজের।

সাথীদেরকে মুতমাইন (প্রশান্ত) করুন। দেখুন! ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে বসা ছিলেন। এমন সময় হাসান বা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে বললেন, আমার নানার মিম্বর থেকে নামো। সঙ্গে সঙ্গে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, দেখুন এ কথা এ বাচ্চা বলেছেন, আমি তাকে বলাইনি। অর্থাৎ এমন মনে করো না যে, আমার ঘরে হয়তো এমন কোনো আলোচনা হয়েছে। আগে থেকেই পরিষ্কার করে দিলেন। অথচ তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে খুবই পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

এজন্য সাথীদের সম্পর্কে দিলকে সাফ রাখুন। সাথীদের আস্থাকে বাড়ান। নিজ সাথীদের ফাজায়েল অর্থাৎ সাথীদের গুণাগুণ বা কৃতিত্ব বর্ণনা করুন। আমরা তো সাথীদের দুর্বলতা ও দোষ চর্চায় লিপ্ত। অথচ মেজাযে নবুওয়াত হলো, অন্য সাথীর সামনে সাথীর গুণ বয়ান করা।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথীর ফাজায়েল অন্য সাথীর সামনে বয়ান করতেন। একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন তোমাদের সামনে দিয়ে একজন জান্নাতী মানুষ যাবে। এভাবে তিন দিন পর্যন্ত বললেন, একই ব্যক্তির (সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে। তিন দিন পর আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, আমি আপনার ঘরে তিন দিন থাকতে চাই। (উদ্দেশ্য ছিল, তার আমল তথা তাহাজ্জুদ, দু'আ ও তেলাওয়াত ইত্যাদি দেখা।) আমিও জান্নাতী হব।

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি তাকে একদিনও তাহাজ্জুদে উঠতে দেখলাম না। তিন দিন পর তিনি হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, ভাই! আপনাব তেমন কোনো

আমল তো দেখলাম না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ভাই! আমার মা'মূল সত্য। আপনি যা দেখেছেন ততটুকুই। হ্যাঁ! তবে একটা বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো মুসলমানকে কোনো কল্যাণ দিয়ে দেন তাহলে আমার অন্তরে তার ব্যাপারে কোনো ধরনের হাসাদ (হিংসা) বাসা বাঁধে না।

এ কাজ আপসের সাহায্য দ্বারাই চলবে। যখন আল্লাহ তা'আলা কারো দ্বারা কোনো কাজ নেন তখন সাথীদের অন্তরে তার ব্যাপারে হাসাদ ও হিংসা হতে থাকে। আর হাসাদ মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন লাকড়ি বা কাঠকে খেয়ে ফেলে। অথচ এখানে হাসাদ করার কোনো অবকাশই নেই। কারণ, কাজ তো খোদ আল্লাহ তা'আলার। আর তিনি তার কাজ যাকে দিয়ে ইচ্ছা তাকে দিয়ে নিবেন। এখানে আমার আপনার বলার কী আছে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি কার মাধ্যমে তার পয়গাম পাঠাবেন।

অন্যত্র এসেছে, আল্লাহ তা'আলা নিজে নির্বাচন করেন মানুষ ও ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে থেকে তার কাজের জন্য।

সুতরাং হাসাদের কোনো অবকাশ এখানে নেই। এজন্যই যখন কোনো নতুন সাথী আগে বাড়ে তখন পুরানোরা তার পা ধরে টান দেয় যে, আমাদের উপস্থিতিতে কোথায় যাচ্ছো? এরপর তার সাহায্যকারী না হয়ে উল্টা তার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। কী বলব ভাই! শয়তান এটা আমাদের দিলে আনবেই যে, আমরা পুরানোরা থাকতে নতুনরা আবার কিভাবে আগে বাড়বে? অথচ এটা একটা পাকা কথা যে, পরে যারা কাজে লাগবে তাদের আমলের হিসসা (অংশ) পূর্বের সবাই পাবে।

সাহাবাদের মেজায ছিল, কাউকে আগে বাড়তে দেখলে নিজেকে তার সাথে সাথী হিসেবে কাজে লাগাতেন। আমাদের এ কাজে সিনিয়র, জুনিয়র বলতে কিছু নেই। অমুককে আগে করো, অমুককে পিছে করো। না ভাই! আগে-পিছে তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন।

অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা নতুনদের থেকে এমন কাজ নিয়ে থাকেন যা পুরাতনদের থেকে নেননি। একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ইয়েমেনী তরবারীটি কে নিবে? ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ তরবারী নেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয় ও কুরাইশী। সব যোগ্যতা ছিল কিন্তু তাকে দিলেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই ইয়েমেনী তরবারীটি কে নিবে? এবারে হযরত যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়ালেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও দিলেন না। তৃতীয়বার আবারও জিজ্ঞেস করলেন, কে নিবে এ তরবারীটি এবং কে এর হক আদায় করবে? এবার হযরত আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়ালেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তরবারীটি দিয়ে দিলেন। অথচ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর যোগ্যতা তার চেয়ে অনেক গুণে বেশি ছিল। এমনকি তার ব্যাপারে তো হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, আমার পরে যদি কোনো নবী হতো তাহলে ওমর হতো। হযরত আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ তরবারী নিয়ে জিহাদে অংশ নিলেন। হযরত জুবায়ের তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন যে, ব্যাপার কি? আমাদেরকে তরবারীটি না দিয়ে তাকে দিলেন কেন? হযরত আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বীরত্বের সাথে সে তরবারী দিয়ে কাফেরদের শিরোচ্ছেদ করতে লাগলেন। এমন করেননি যে, আমরা মাশওয়ারাতে যাব না। কারণ, আমাদেরকে দেয়া হয়নি। সীরাতে এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে।

এমনকি বড়দের উপস্থিতিতে ছোটদেরকে আমীর বানানোও হয়েছে। যাতে এতা'আতের ইমতেহান (পরীক্ষা) হয়ে যায় যে, যদি তোমাদের আমীর এমনও হয় যে, তার মাথা শুকনা, কিচমিচের মতো কালো বা হাবশী গোলাম হয় তাও তার এতা'আত করো। বড়দের মানা তো সহজ কিন্তু ছোটদেরকে মানা সহজ নয়। হযরত উসামাকে আমীর বানানো হলো। অথচ জামা'আতে বড় পুরানো সাহাবারা ছিলেন। এমনকি তাকাজাও এলো আমীরের পরিবর্তন করার জন্য।

সাথী ছোট হোক, যেমন হোক তার থেকে কাজ নেয়া চাই। এটাই অর্থ ঐ হাদিসের যেখানে বলা হয়েছে লোকদের সাথে তার মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করো। সাথীদেরকে ব্যবহার করো তাদের যোগ্যতা অনুসারে।

আরেকটি জরুরি কথা হলো, কখনও মজলিসে বা মাশওয়ারায় সাথীদের হাইসিয়াত (পদমর্যাদা) নষ্ট করবেন না। অনেক সময় মনে করা হয় যে, মাশওয়ারায় তাকে একটি ধমক দিয়ে দিব তাহলেই তার এসলাহ হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল। খুব ধ্যানের সাথে শুনুন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বসা ছিলেন নিজ কামরায়। খাদেম আসলামকে বললেন তুমি দরজায় বস। কেউ যাতে ভেতরে না আসে। খাদেম দরজায় বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এলেন। হযরত যুবায়ের ছিলেন অনেক মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী। যখন আসলাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ভেতরে যেতে পারবেন না। তখন হযরত জুবায়ের রাযিয়ার্লাহু তা'আলা আনহু আসলাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এক থাপ্পড় মেরে বসলেন যে, তুমি একজন গোলাম হয়ে আমাকে বাঁধা দিচ্ছো? হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভেতরে থেকে তা শুনে ফেললেন। আসলাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আসলাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘটনা শুনালেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, জুবায়ের! যখন জঙ্গলে কোন প্রাণীকে আহত করা হয় তখন অন্য প্রাণীরা তাকে খেয়েই ফেলে।

অর্থাৎ যখন কোনো প্রাণীকে আহত করা হয় তখন সে তার আত্মরক্ষার সীমানা থেকে ছিটকে পড়ে যায়। তখন অন্যান্য সবল প্রাণিরা তাকে একেবারে খেয়েই ফেলে। একথার উদ্দেশ্য হলো, যখন তোমরা সাথীদেরকে আহত করবে ও সাথীদেরকে প্রভাবহীন করে দিবে তখন বাহিরের লোকেরা তার উপর চেপে বসবে। আমার কথা বুঝে এসেছে ভাই?

এজন্য নিজ সাথীদের এহ্‌তেরাম করুন মজমার সামনে। এটা রিয়া নয় বরং এটাতো নিজ মুসলিম ভাইয়ের দিলকে খোশ করা। যদিও লোকেরা জানে যে, তাদের আপসের সম্পর্ক এমন। মহব্বতকে প্রকাশ করুন, আর এখতেলাফকে লুকান। যদিও এমনটি করতে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয় ও ছলনাবাজী করতে হয়।

সাথীর একরাম করুন, সাথীর সামনে যদিও দিল না চায়। দিলে কাঁটা থাকে থাকুক। এটা কোনোভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ পাওয়া না চাই। আমাদের মহব্বত মানুষ দেখুক, এখতেলাফ না দেখুক। অন্যথায় বাতিল আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ ঘটাবে।

নামাযে মিলে মিলে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। কেন? এ জন্য যে, যাতে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। তেমনি আমাদের মহব্বতই মানুষ দেখবে এখতেলাফ নয়। নতুবা দুশমন বা বাতিল প্রবেশ করবে। এ হুকুম সব জায়গায় যে, আপোষে জোড় ও এত্তেকাফ (ঐক্য) হোক যে, দুশমন অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

সাথীদের প্রতি আস্থা বাড়ান। তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) করুন। সাথীদের ভুলের ভাল ব্যাখ্যা করুন, যদিও ব্যাখ্যা মিথ্যা হোক না কেন। আমার তো খুব মন চায় যে, এমন করব। যে মিথ্যা সাথীর দোষ লুকানোর জন্য এবং মহব্বত কায়েম করার জন্য বলা হয় সে মিথ্যা তো প্রিয় বা কাম্য। যদি কখনও এমন কিছু হয়ে যায় তো আপসে এমন মহব্বত বা ঐক্য প্রকাশ করুন যে, লোকেরা ভাবে যে, আমরা তো ভুল বুঝেছিলাম।

আমি একবার সৌদি এয়ারলাইন্সে ওমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। পথে এয়ারলাইন্স কর্মীদের কার্যক্রম শুরু হলো। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির। তাদের ক্রু'দের মধ্যে আপসে কী যেন বিষয় নিয়ে এখতেলাফ (মতানৈক্য) দেখা দিল। খুব শক্ত ঝগড়া শুরু হলো। একে অপরকে আরবীতে বলছিল। কিন্তু চেহারা দিয়ে কাউকে বুঝতে দিচ্ছিল না। আর সাথীরা সবাইতো আরবী জানেও না।

এরপর তারা তাদের নির্ধারিত জায়গার ভেতরে গিয়ে খুন ঝগড়া করলো। গালিগালাজ করল। আমার সিট তাদের কাছাকাছি ছিল। আমি তাদের সবকিছুই শুনে যাচ্ছিলাম। এর কিছুক্ষণ পর যখন বের হলো তখন একদম হাসি মুখে। এমন মিলেমিশে যে, অন্যদের বুঝাই দায় হয়ে পড়েছিল যে, একটু আগে তাদের মধ্যে কিছু হয়েছিল।

আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? সে বলল, না কিছু নয়।

আমি বললাম, আমি তো শুনলাম, ঝগড়া হলো, গালি-গালাজ হলো।

সে আমার হাত ধরে বললো, আপনি কী শুনেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ!

সে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে বলবেন না। একসাথে চলতে গেলে এক আধটে কিছু হয়েই যায়। কিন্তু যদি লোক জানে তাহলে আমাদের কোম্পানীর বদনাম হবে।

লক্ষ্য করুন ভাই! এক কোম্পানীওয়ালা কোম্পানীর পরোয়া করছে। আর আমরা সবচেয়ে বড় কাজ করছি। আর আমরা পরোয়া করি না যে, আমরা কী করছি? লোকেরা আমাদের তামাশা দেখছে। আমরা কি করছি? জাহাজ কোম্পানি যাদের উদ্দেশ্য শুধু পয়সা ছাড়া আর কিছু না। তারা চিন্তা করছে যে, আমাদের বদ আখলাক মানুষ দেখলে কোম্পানীর বদনাম হবে।

আর আমরা উম্মতের তরবিয়তের মেহনত করছি। অথচ কোনো কিছুর পরোয়াই করছি না।

তখন ঐ ক্রু বলল, হ্যাঁ! একটু হয়েছে। তবে আমরা সেটাকে মিটিয়ে ফেলেছি।

মেরে মুহতারাম দোস্ত!

আল্লাহ তা'আলার সত্তা অমুখাপেক্ষী। তাঁর কাজও অমুখাপেক্ষী। তার দ্বীনও অমুখাপেক্ষী। দ্বীনের মেহনত অমুখাপেক্ষী। তোমরা কাজ না করলে অন্য কাউকে দিয়ে তিনি কাজ করাবেন। কাজ তো তোমাদের উপর

নির্ভরশীল নয়। তিনি প্রয়োজনে সরিয়ে দিবেন। যে মাছ নদীতে বা পুকুরে মারা যায় পানি তাকে উপরে ভাসিয়ে দেয়। যাতে ভেতরে বাকিদের হেফাজত হয়। তেমনি কাজের লোকসান বা ক্ষতি হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বের করে দিবেন।

এ জন্য আমার দরখাস্ত হলো, যে ভাবেই হোক আপসের সম্পর্ক মহব্বত টিকিয়ে রাখা চাই। এহ্তেরামের সাথে চলা আমাদের কাজ। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের ফাজায়েল বয়ান করেছেন যে, আনসাররা এমন ও মুহাজিররা এমন। সে দিকে তাকিয়ে আমরা কাজ করতে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত